বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শৈলেশ বিশী

শিশির পাবলিশিং হাউস

২২।১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন প্রশ্ন

বইএর পরিচয়

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁহার অনুদ্ঘাটিত জীবনের কাহিনী শিল্পীর নিজের মুখের কথায়, লেখক অননুকরণীয় ভাষায় উপন্যাসের চাইতেও মনোরম অথচ সহজ সরল ঘটনা সমাবেশ করে, বাস্তবজীবনের যে আশ্চর্য্য জীবন-বোধের পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর লেখার তুলনা করা চলে একমাত্র **ইসাডারা ডাঙ্কানের** সাথে।

নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবন ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রদের কেন্দ্র করে লেখক যে জীবন প্রশ্ন বিশ্লেষণ করেছেন, তাহা বিস্ময়কর, যে প্রশ্নের কোন সমাধান কোন দিন কেহ করতে পারেনি—যে প্রশ্ন, আমার—আপনার, সকলের···সকল দেশের, সেটা শাশ্বত।

এই বই বাঙ্গলার সমালোচনা সাহিত্যে ও মন-বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে যুগান্তর এনেছে। ইং ১৯২১ হতে ১৯৩৯ সাল

পর্য্যন্ত বাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক ও কৃষ্টিগত জীবনে প্রত্যক্ষদর্শীর বিচিত্র অনুভূতি দিয়ে লেখা।

আর আছে লোকোত্তর চরিত্রের মধ্যে—রবীন্দ্রনাথ, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, শরৎচন্দ্র ও আরো অনেক নেতাদের রাজনীতির অন্তরালে তাঁদের কৃষ্টিগত জীবনের দুই একটি রেখাপাতে অপূর্ব্ব বিশ্লেষণ ও চরিত্রাঙ্কন।

জগতে যারা ভবঘুরে ছন্নছাড়া
ও নিন্দিতচরিত্র
তাদের হাতে

জনসেবক পত্রিকার সম্পাদনার কাজে শরৎদার সাথে আমার পরিচয়। আমার বেশ মনে পড়ে, আমি তখন তরুণ। ইং ১৯১৯।২০ সাল হবে, আমি জোরসে জনসেবক কাগজ চালিয়ে স্বর্গগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, দেশবন্ধু প্রভৃতি সকলকে বেপরোয়া কার্টুন ও নক্সা-চিত্রে সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছি। কার্টুনের ছবি আঁকতেন বিখ্যাত শিল্পী চারু রায়, সেই কার্টুনের ভাবকে কবিতায় রূপ দিতেন স্বর্গগত কবি হেমেন্দ্র লাল রায়। আর কাগজ সম্পাদনায় সাহায্য করতেন * পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসাতে পবিত্র নিয়ে এলেন একদিন শরৎদা'কে। সুকিয়া ষ্ট্রীটের বাসা আমার অফিস ও আড্ডা দুইই ছিল। আমার বেশ মনে পড়ে—সময়টা তখন কাজী (নজরুল) যখন হুগলী জেলে প্রায়োপবেশন করছেন।

শরৎদা এলেন। দীর্ঘকায় পুরুষ। হাতে মোটা বেতের লাঠি, পায়ে বিদ্যাসাগরী চটি, গায়ে পাঞ্জাবী। বোধ হয় কাঁধের

* অনুবাদক, সাংবাদিক ও প্রবীণ লেখক।

উপর একখানা এণ্ডির চাদরও ছিল। হাসিমুখ, চুল পাকেনি সব। সবে তিনি এসে বসলেন। আমরা সন্ত্রস্তে উঠে—তাঁর পায়ের ধুলা নিলুম। তিনি হেসে বললেন, 'যদি তোমার কাগজে লেখা চাও, আমার সাথে তোমার ভাব থাকবে না। আর যদি আমার লেখা না চাও, তোমার সাথে আমার চিরদিনের ভাব।' তিনি গুরুজন—তাঁর মুখের কথা তিনি মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত বর্ণে বর্ণে ঠিক রেখেছিলেন।

শরৎদা যে আমাদের কতখানি প্রিয় ছিলেন, সে কথা বলতেই পারা যায় না ও প্রিয়জনের কথা বলতে গেলে সব কথা মনের মধ্যে এমন তোলপাড় করে ওঠে যে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে বলব, সেটা সঠিক বলতে পারা যায় না।

তারপর, কতো যাওয়া, কতো আসা. কতভাবে মেলামেশা। দিনের পর দিন যাওয়া আসা, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলেইছে তাঁর ওখানে। এই মানুষটি সময়ের মাপকাটি দিয়ে কোন দিন কিছু যাচাই করেন নি। তিনি যাচাই করেছেন—হৃদয় দিয়ে। তাঁর বাড়িতে যে কেউ গেছেন, হয়তো দেখেছেন তাঁর ঘড়ি উল্টো করে রাখা আছে বা ঘড়িটি বন্ধ।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, কী আপনাদের এত কথা হতো? সে কথা বলতে পারবো না। হতো না যে কি সেই কথাই বলতে পারি। আলোচনা হতো—সাহিত্য—সমাজ—রাজনীতি—তাঁর জীবনের কথা। বয়সের পার্থক্য তাঁর সাথে কোনদিনই আমরা মনে করতুম না,—তিনিও তা করতেন

না। তবে মর্য্যাদার সীমা কোনদিন আমরা লঙ্ঘন করি নি। তিনি অন্যের লেখার কোনদিন সমালোচনা করতেন না বা কখনও তাঁকে বলতে শুনি নি যে অমুক লেখকের লেখা খারাপ।

এই স্মৃতি-পূজায় সময় বড় রকম ব্যবধান সৃষ্টি করছে। সময় হচ্ছে—১৯১৯।২০ থেকে ইং ১৯৩৯ সাল। এই সতেরো আঠারো বৎসরের কথা এতদিন পরে গুছিয়ে বলা মুশকিল। আর স্থান হচ্ছে—কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী, কলিকাতার বাইরে বাজে শিবপুর (হাওড়া), নবদ্বীপ, কাশী, সিরাজগঞ্জ ও শামতাবেড়। আর পাত্র হচ্ছেন, বিভিন্ন জনসমাবেশ,—আর লোকোত্তর চরিত্রের মধ্যে দেশবন্ধু, সুভাষবাবু প্রভৃতি।

তবে কাল নিয়ে মাথা ঘামাবো না। কালটা আমাদের যৌবন। এই অজুহাতেই ত্রুটী-বিচ্যুতি কেটে যাবে ভরসা করি। তা না হলে নিখুঁত সময়ের ঠিকানা দিতে পারবো না হয়তো।

বাজে শিবপুরের একতলা একখানি ছোট কোঠা বাড়ি। হয়তো ওপরে আর দু'খানি ঘর ছিল, তবে তার বাইরে থেকে একতলাই দেখায়। ছোট একটু আঙিনা, তাতে একটা পেয়ারা গাছ, উঠানে গোটা দুই ফুলের গাছ—টগর, শেফালী জাতীয়। বাড়িতে কোন শ্রী নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই। উঠানে ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দায় দাদার সাবেক কালের লম্বা হাতা ইজিচেয়ার। তার একপাশে একটি টিপয়। অন্যপাশে

ছোট টুলের উপর তাঁর লম্বা নল গড়গড়া, তার পাশে একটি পেতলের পিকদানী। ইজিচেয়ারের সামনে বা পাশে চেয়ার বা বেঞ্চি ছিল কিনা তা আমার মনে নেই, ঘরে ঢুকতেই দোর গোড়ায় দড়ির ময়লা একটা পাপোছ।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায় ঢালা ফরাস, চাদর সব সময় পরিষ্কার থাকতো না। গোটা দুই তাকিয়া। পাশে একটা খোলা বুকশেল্‌ফ। তাতে তকতকে ঝকঝকে বাঁধান বই সাজান, তিন থাক। তাতে সাহিত্য ছাড়া আর সবই ছিল, কঠিন গণিতের বই, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র। তবে ভুতুড়ে বা পরলোকতত্ত্ব দেখিনি। আর ছিল কাঠের পাল্লা, মার্বেলটপ নয়, একটি বন্ধ চেষ্ট অব ড্রয়ার্স। তার মাথার উপর না ছিল এমন জিনিষ নেই। ঘরে গোটা চারেক কুলুঙ্গী ছিল। তার একটাতে ছিল—কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের নমুনা হিসাবে গৌর-নিতাইয়ের যুগল মূর্ত্তি। তার নীচে যা থাকতো তা বলাই ভাল। একটি কাঁচের পাত্রে বোধ হয় আফিং ভেজান থাকতো। লেখবার সময় মাঝে মাঝে দাদা তা দিয়ে গলা ভেজাতেন।

ফরাসের উপর ছিল হাত দেড়েক লম্বা, অনুপাতে চওড়া, বর্ডারে দামী মেহগনী কাঠ এমবস করা একখানি ঠাকুর বাড়ি-মার্কা হাত টেবিল। তার উপর ছিল দাদার লিখবার প্যাড। একটি ডাবের উপর 'শরৎ' এই কথাটি এমবস্ করা। লেখবার প্যাড মরক্কো দিয়ে বাঁধান। হাতটেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড্—সেটারও চারপাশে মরক্কো দিয়ে বাঁধান। দাদার লিখবার

জিনিষগুলি এতই দামী ছিল। সেই হাত টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য কাঠের পাত্রে থাকতো ডজন খানেক, নানা আকারের ও নানা ছাঁদের ফাউটেনপেন, পার্কার হতে ওয়াটারম্যান সব রকম এবং যখন যে ভাল ফাউনটেনপেন বেরুতো তা। প্যাডের পাশে দুটো এন্টিএ্যায়ারক্রাফট্ গানের মত মাথা উঁচু করে থাকতো ফাউনটেনপেন হোলডার। এই গেল দাদার পটভূমি। তখন-কার দিনে অন্তরঙ্গ নিত্য সঙ্গী ছিল লোমশূন্য ভেলু কুকুর, ভোলা চাকর, আর আমরা তিনজন পবিত্র, *অবিনাশ ও আমি।

সকলেই জানেন, হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে দাদার জন্ম। এই পরিবার অবস্থার বিপর্য্যয়ে বেহারের কোন শহরে আত্মীয় বাড়িতে আশ্রয় নেন। তখন তিনি বালক, তাঁহাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করবার, গুরুজনের তাড়না ও চেষ্টার ক্রুটী ছিল না। তার ছাপ রেখে গেছেন—তাঁর 'বহুরূপী' চরিত্রে।

দেবানন্দপুরের পাঠশালার ছাপ আমরা দেখতে পাই 'দেবদাসে'। যাঁর মধ্যে দুর্দ্দান্ত 'ইন্দ্রনাথ' ঘুরে বেড়াতো সর্ব্বদা, তাঁর এই সব ছেলে খেলায় মন বসবে কেন? গঙ্গার ধারে নির্জ্জন বনের মধ্যে সুপরিষ্কৃত একটা জায়গা ছিল তাঁর অনুগত সঙ্গাদের সাথে মিলবার আড্ডা। এইখানেই তাঁর লুকিয়ে তামাক খাওয়া চলতো, তার ছবি আমরা দেখতে পাই 'দেবদাসে'। আর দেখতে পাই—'পথের দাবীর' 'সব্যসাচীর' অঙ্কুর! ইন্দ্রনাথ

* বাতায়ন সম্পাদক ও ঔপন্যাসিক।

বনে লুকিয়ে বসে বসে হুকুম করছেন তাঁর সঙ্গীদের, চুরী করে মাছধরার পরামর্শ আঁটছেন, গভীর অমাবস্যার অন্ধকারে মাছচুরী হয়তো করছেনও বা। তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষার ফীর টাকা নিয়ে হাঁটাপথে উড়িষ্যা পাড়ি দিলেন। এই সময়ের কথা দাদার মুখে শুনেছি। হাঁটতে হাঁটতে পা দু'খানি ক্ষতবিক্ষত হয়ে ফুলে গোদাপা হয়েছে। মেদিনীপুর পেরিয়ে রাতে আর কেউ তাঁকে ঘরের বারান্দার চালাতেও আশ্রয় দেয় নি।

তখন সময়টা রথের। সেবার কলেরা লেগে দলেদলে নরনারী-শিশু মরে পথে পড়ে আছে। কেউ বা ধুঁকছে। কেউ মুখে এক ফোঁটা জলের জন্য পথে পড়ে জল জল করছে, কিন্তু জল কেউ দিতো না।

দশটাকা মাত্র সম্বল করে এই বালক জীবনের প্রথম সাড়া দিল, পথের ডাকে—সুদূরের অজানার আহ্বানে। উড়িষ্যা পৌঁছে তিনি ঠাকুর-দেবতা দেখেন নি। তিনি দেখতে গিয়েছিলেন মন্দির আর সমুদ্র। ওদুটো দেখা শেষ করে তিনি ফিরলেন দেশে। এবার কোথা থেকে পাথেয় জোগাড় করেছিলেন হয়তো। এসে দেখলেন তাঁর বাবা মারা গেছেন। বিধবা মা; পোষ্য দুই ছোট ভাই, রোজগার না করলেই নয়।

কিন্তু তিনি করলেন এক সখের থিয়েটারের দল। পাখোয়াজ তিনি খুব ভালো বাজাতে পারতেন, খোলে তাঁর বেশ হাত ছিল। রাত জাগতে হতো বলে এই সময় তিনি গাঁজা খেতে অভ্যাস করেন।

বাড়ি থেকে পালানো ছেলে, গেঁজেল চরিত্রহীন বলে সুনাম তাঁর চারিদিকে রটে গেল! তিনি চললেন এই ব্যথিত ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে সুদূর বর্ম্মায়—রোজগারের আশায়।

পথে জাহাজের খোলে (Dugout) দেখা পেলেন—কিরণময়ী, মিস্ত্রী ও দিবাকরের সাথে। তাদের তিনি অমর করে গেছেন।

সুদূর বর্ম্মা। জন বিরল শহরতলীতে এক কাঠের দোতালা বাড়ি। দূরে ইরাবতী নদী দেখা যায়। রেঙ্গুন থেকে কলিকাতা-গামী জাহাজ ধোঁয়া ছেড়ে চলে যায়, তিনি উদাস হয়ে দেখেন। কলিকাতা থেকে রেঙ্গুনের ডাক জাহাজ আসে, তার চোঙের ধোয়া তাঁর দোতলা কাঠের বাড়ির ওপর দিয়ে মেঘের কুণ্ডলী করে উড়ে যায়, এই তরুণ শিল্পী মনে মনে নতুন মেঘদূতের রচনা করেন।

এই কাঠের বাড়ির নীচে ছোট একটি ষ্টেশনারী দোকান, এটী তাঁর নিজের। সকাল সন্ধ্যায় কেনা বেচা করেন। দশ পাঁচটায় অফিস করেন, আর সারারাত লেখেন। রাতে সেদিকে ভয়ে যায় না, চোর-ডাকাতের আড্ডা। ক্রমাগত তরুণ শিল্পী নিজ মনে তাঁর কথার মায়াজাল বুনছেন সঙ্গীহীন একা। এইখানেই তিনি সব্যসাচীর দেখা পেয়েছিলেন, সে কথা আমি পরে বলবো।

যে বর্ম্মা মেয়েদের এত রূপের খ্যাতি, ফায়াতে ফুল কিনতে গেলে মনে হয়—ফুল কিনি, না মানুষ কিনি; সে বর্ম্মা মেয়েরাও তাঁর মনে কোন ছাপ রাখতে পারে নি।

এই আত্মীয়-বান্ধবহান সুদূর বিদেশে তাঁর মন ঘুরে বেড়াতো বাংলার আমবনে, বাঁশবনে, পুকুরপাড়ে। তিনি খুঁজে বেড়াতেন বাংলার মেয়েদের, তাদের দেখাও তিনি পেয়েছিলেন—সমস্ত দরদ দিয়ে তাঁদের কথা লিখতে আরম্ভ করলেন। তাঁর স্নেহকাতর মনে বোনের ভালবাসা যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল আমরা তা দেখতে পাই, 'অন্নদাদিদি' ও 'বড়দিদিতে'।

'বড়দিদি' বের হবার পর চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল। কে এই লেখক! সকলে মনে করলেন রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ নন। তিনি বললেন আমি নই।

তখন খোঁজ, খোঁজ, শেষে যমুনা সম্পাদক ফণী পাল তাঁকে আবিষ্কার করলেন। তারপর বেরুতে লাগল তাঁর লেখার পর লেখা যমুনাতে, কথায় রঙের হোরীখেলা চললো, যেন কথার রংমশাল!

'নারীর মূল্য' তার মনের কথা। এই নারীর মূল্যতেই বোঝা যায়, কী সম্ভ্রম ও দরদ দিয়ে তিনি মেয়েদের দেখতেন। এক কথায় বলা যায়, নারীর প্রতি কী অকুণ্ঠ মর্য্যাদা বোধ ছিল তাঁর!

আমাদের সমাজে আমরা নারীকে কোন্ মূল্য বা মর্য্যাদা দিয়েছি তা' আমরা ভাল করেই জানি। নারী যখন বালিকা তখন সে বাপ-মায়ের অধীন। তাকে নানা রকম বাধা-নিষেধের গণ্ডীর ভেতর বাপ-মায়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মাফিক গ'ড়ে তোলা হয়। এই শিক্ষা-সংস্কৃতি মাত্র একই কথা বালিকাকে শেখায়, তুমি

বড় হয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার করে সুখী হবে। তাকে প্রতি পদক্ষেপে তার সুপ্ত যৌন কামনারই ইঙ্গিত দেওয়া হয়। তারপর এলো তার যৌবন। যার সাথে বিয়ে হলো—তার সাথে পরিচয়ের বা তাকে জানবার সুযোগ সে পেলো না। বাপ-মা বা আত্মীয়-বন্ধু চায় বরের টাকা-বাড়ি, গাড়ী, সামাজিক position। হয়তো বা সে পেলেও এসব। সেও ভাবলে, লোকে যা চায় আমিও তাই পেয়েছি, নিজেকে সে সুখী মনে করলো। ঘটনার চাপে সে মাতৃত্বে উপনীত হলো; কিন্তু তার মনের খোঁজ কেউ করলে না। তখন হয়তো তার ঘর ভরা ছেলেমেয়ে—হঠাৎ সে অনুভব করলো নিজের মধ্যে তীব্র একটা গতিবেগ, একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, একটা আকস্মিক অনুভূতি।

প্রথম সে হকচকিয়ে গেল। তার কাছে, তার বাড়ি-ঘর ছেলে-মেয়ে সব মিথ্যা হয়ে গেল। তার মনে হলো, এগুলো তার খেলা ঘর। অথচ তার মনের অপূর্ব্ব অনুভূতি—যাতে সে ক্ষণেকের জন্য অমৃতরসে অভিনন্দিত হয়েছিল, সেটা তার মনের মধ্যে শুকিয়ে গেল। পুরুষের গড়া সমাজ, পুরুষের গড়া আইন সব তার বিরুদ্ধে। কী আর সে করবে? সে মনের মধ্যে মুষড়ে পড়লো। শরৎচন্দ্র নারীর মনের এই কথা জেনেছিলেন, সেই জন্য তাঁর সৃষ্ট সব নারী চরিত্র যেন একই কথা বলছে—সে যাকে বরণ করে, সেই পায় তাকে যমেবৈষং বৃণুতে।

দরদী শরৎচন্দ্র

ভেলু

ভেলু কুকুরের কথা আগেই বলেছি। কিন্তু ভেলুর কি স্বরূপ এবার তা' বলতে হবে। বাজে শিবপুর শরৎদা'র বাড়ী যাবার আগে পবিত্র আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, "শরৎদা'র ঘরে ঢুকতেই একটা লোমশূন্য কুকুর তোমাকে ঘেউ ঘেউ করে তাড়া করে আসবে, চাই কি এক কামড় দিতেও পারে, তুমি একেবারে 'নট ইজ দি নড়ন-চড়ন' হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। এই ভাবে দ্বার-দেবতাকে যদি সন্তুষ্ট করতে পার, তবেই মন্দিরে ঢুকে দেব-দর্শন হবে। কিন্তু সাবধান! ভুলেও যেন কুকুরের নিন্দা করো না, তাহলে শরৎদা জীবনেও তোমার মুখ দেখবেন না।"

বাজে শিবপুরের বাড়ীতে তো পবিত্রের সাথে একদিন পোঁছান গেল। ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই ভেলু একেবারে ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এলো। প্রাণ যায় আর কী! আমার আবার ছেলেবেলা থেকেই কুকুরের ভয়। পবিত্র দাঁড়িয়ে হাসছে। শরৎদা ইজি-চেয়ারে শুয়ে, তিনিও হাসছেন। তিনিও ভেলুকে কিছু বললেন না। ভেলু ঘেউ ঘেউ করে আমার চারিদিকে ঘুরে আমাকে শুঁকতে লাগলো। তারপর গেল শরৎদা'র কাছে। তিনি তখন বললেন, ওকে আসতে দাও, কিছু বলো না। চুপ কি আর সে করে, ভেলু গরগর করতে লাগলো,

আমি তখন বসলুম। শরৎদা তখন সবিস্তারে ভেলুর গুণ বর্ণনা আরম্ভ করলেন, "এই যে ভেলুকে দেখছো, এর মত একটি শান্তশিষ্ট কুকুর আর দেখতে পাওয়া যায় না। তবে কিনা একটু এ'রকম করে। একবার কি হয়েছিল জান? রাস্তা দিয়ে একটা লোক যাচ্ছিল, ভেলু একতালার ছাদ থেকে এক লাফ দিয়ে নেমে ঘ্যাঁক করে কামড়ে তার পায়ের এক খাবলা মাংস তুলে নিলে। তখন আমি কি করি, লোকটাকে ডেকে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে দশটা টাকা দিয়ে বিদেয় করলুম। তারপর ভেলুকে পাঠালুম ট্রপিকালে—তার মুখের লালা পরীক্ষা করাতে। তাতে ভেলু পরীক্ষায় পাশ করে ফিরে এলো। কিছু ভেবো না, ও যদি তোমাকে কামড়েও দেয়, জলাতঙ্ক রোগ হবার তোমার ভয় নেই।" পরে আমাদের অনুরোধে ট্রপিকাল থেকে বছরে দু'বার ভেলুর লালা পরীক্ষা হয়ে আসতো। কারণ দাদাকেও ভেলুর আঁচড়-কামড় কম খেতে হতো না!

তারপর চা' এলো। ভেলু চায়ের পেয়ালার কাছে গিয়ে গা' ঝাড়তে লাগলো। তার গায়ে যেমনি দুর্গন্ধ, তেমনি পোকা। চায়ের পেয়ালাতেও পোকা পড়ল হয়তো; কিন্তু পবিত্র বলে দিয়েছিল, ও' চা যদি না খাও, দাদা জীবনে তোমার মুখ দেখবেন না। এইরূপ ঘটনা নিত্য—ভেলুর ঘেউ ঘেউ, ভেলুর গা ঝাড়া, ভেলুর গায়ের পোকা সমেত চা' খাওয়া। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতুম, তুমি যদি থাক, ভেলু যেন শীগ্‌গীরই মরে যায়। কিন্তু ভেলু মরত না।

বছর চা'রেক এইভাবে যায়। শরৎদা তখন কাশী গেছেন, সালটা আমার মনে নেই। আমিও তখন কাশীতে। কাশীতে একেবারে আড্ডা জমে গেল। সেখানকার যতো সাহিত্যিক আর যতো ভদ্রলোক মিলে দাদার ওখানে 'চা' ও গল্পের আসর জমিয়ে তুল্লেন। শরৎদা গঙ্গায়ও নাইতেন না, মন্দিরেও যেতেন না। তিনি ছিলেন * মণিবাবুর বাড়ীতে। তাঁর বাড়ীতে মন্দিরের চাইতেও বেশী ভীড়, দিনরাত চায়ের জলছত্র! শরৎদা আমাদের ডেকে বললেন, "কাশীতে এলে বামুন খাওয়াতে হয় না হে?"

আমরা বললাম, হাঁ, ব্যবস্থা করে ফেলুন। কারণ আমরা জানতুম সেদিন একটা বড় রকম ভোজের ব্যবস্থা হবে—আমরাও ভাগ পাবো। শরৎদা বললেন, "আমি কি ঠিক করেছি জান, আমি কুকুর খাওয়াবো। ছাখো কাশীতে কুকুরের ভারী দুঃখ। অমনিই তো এটা বামনাইপনার জায়গা, শুচি-অশুচি নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি। কুকুরদের দেখলেই অশুচি, স্পর্শ করলেই স্নান করতে হয়। ওরা এখানে না খেয়েই মরে যাচ্ছে। ভেবে দেখলুম, ওরাই সবচেয়ে দুঃখী, ওদেরই খাওয়ান যাক।" তারপর আমাদের উপর ভার পড়লো, রাস্তার কোন্ মোড়ে কুকুর বেশী জমায়েত হয় তার খোঁজ করা। আমরা বললুম, নেমতন্ন তো করা যাবে না। দাদা বললেন, সে ভার আমি নিলুম। হলোও তাই। মণে মণে লুচি ও বঁদে এলো। আমরা রাস্তায়

* নাট্যকার, সাংবাদিক মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে কুকুরের খোঁজ করতে লাগলুম। দাদার কড়া হুকুম—কুকুরদের খাওয়া না হলে কোন মানুষ বা ভিখিরী কেউ খেতে পারবে না। যা বলা তাই করা।

অলক্ষ্যে এক দেবতা হাসলেন। কাশীতে যারা গেছেন তাঁরা বোধ হয় দেখেছেন, বটুক ভৈরব বলে এক শিব আছেন, সেখানে যাঁরা পূজো দিতে যান, আগে তাঁর কুকুরকে খাওয়াতে হয়। আমাদের দেবতাও তাই করলেন।

আরো বছর তিনেক চলে যায়। ভেলু কিন্তু মরে না। ভেলু বেঁচেই চল্‌লো। শরৎদা একবার গেছেন ঢাকায়, বোধহয় স্বর্গীয় চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিমন্ত্রণে। খুব সম্ভব সেবার তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহিত্যের 'ডক্টরেট' উপাধি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর আসতে দেরী হয়। ঢাকা থেকে সবে সেই দিনই তিনি এসেছেন। আমিও ঘটনাক্রমে সেইদিনই তাঁর সাথে দেখা করতে গিয়েছি। আমি ঘরে ঢুকতেই ভেলুর কোন সাড়া পেলুম না। শরৎদার দিকে চেয়ে দেখি, কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ দুটি ফুলে গেছে। আমাকে দেখেই তিনি একেবারে কেঁদে উঠলেন। আমার নাম ধরে বললেন—ভেলু আমাদের ছেড়ে গেছে। কোন প্রিয় আত্মীয় বিয়োগ হলে, কোন অন্তরঙ্গকে দেখলে যেমন সেই শোক উথলে ওঠে, আমাকে দেখে দাদার শোক যেন দ্বিগুণ উথলে উঠল। আমার অবস্থা তখন, আমি হাসি কি কাঁদি? হাসলে তিনি জীবনে আর আমার মুখ দেখবেন না। অথচ কাঁদাও দরকার।

দেখতে পেলুম, দাদার এই দুঃখ ও ব্যথা কত গভীর। কিন্তু কান্না আমার এলো না। মনে মনে আমি শুধু বললাম, ভগবান, এত দিনে আমাদের প্রার্থনা তোমার কানে গেল। আমি যথা-সম্ভব মুখ গম্ভীর করে ধূপ করে তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়লুম। তখন তিনি বলতে লাগলেন, 'এমন যে হবে তা আমি আগেই জানতুম। ঢাকার ষ্টেশনের পথে গাড়িতে আসতে আসতে দেখলুম, মরা কুকুর পড়ে আছে, শকুনি তাই খাচ্ছে। তখনই বুঝলাম, ভেলুর কোন অমঙ্গল হয়েছে, তা না হলে মরা কুকুর দেখবো কেন ? বাড়ি এসে পা দিতেই দেখি ভেলু নেই। তাই দেখেই আমি বসে পড়লুম।' আমি বললুম, দাদা, স্নানাহার— তিনি বললেন, ওসব কিছুই হয় নি। আমি জানতে চাইলুম, দাদা, তাহলে তার শেষের কাজ ? তিনি বললেন, তা হয়েছে, আমি নিজের হাতে বাগানে তাকে কবর দিয়েছি। এখন তোমরা বলতো, ওর একটা স্মারক স্মৃতিস্তম্ভ কেমন হলে ভাল হয় ? আমি বললুম—দাদা, রেসের ঘোড়া মরলে, সেই ঘোড়ার অনুরূপ ষ্ট্যাচু তার কবরের উপর গড়ে দেয়। এও তাই হবে। ভেলুর একটা মার্বেল ষ্ট্যাচু গড়ে দিন। দাদা বললেন, ওরা বলছে, (চেয়ে দেখি, দরজার আড়ালে বৌদি দাঁড়িয়ে চোখ মুছছেন) শ্বেত পাথরের পাদপীঠের উপর একটা মার্বেলের তুলসীমঞ্চ থাকবে। আমি বললাম, খুব উত্তম পরিকল্পনা।

আমি দেখলুম, আজ এদের কারো খাওয়া হয়নি—বিকেল গড়িয়ে গেছে, আমার বেশীক্ষণ থাকা ঠিক হবে না। আমি দাদার

মন রাখবার জন্য বললুম—দাদা, একবার ভেলুর কবরটা দেখতে চাই। তিনি বললেন, আজকে ভেলুর কত কথাই না মনে হচ্ছে, ও আমাকে ছেড়ে এক দিনও থাকতে পারতো না; রোজ রাতে ও আমার সাথে লুচি খেতো, আমার কাছে না শুলে ওর ঘুম হতো না, বাইরে থেকে মশারী ধরে টানাটানি করতো, এই ভাবে কত দামী মশারী যে আমার ছিঁড়ে দিয়েছে, তা বলবার নয়। আজ রাতে আমি যে কি করে খাবো তা ভেবে পাচ্ছি না। ও পশু ছিল বটে, তবে মানুষের বুদ্ধিকে হার মানিয়ে দিতো। ও যতদিন ছিল, বাড়িতে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল না। এবার হয়তো চোর-ডাকাতের হাতেই প্রাণটা যাবে। আমি বললুম, দাদা, ওসব এখন ভাববেন না। পরে ধীরে-সুস্থে ভেবে যা হয় করা যাবে। উনি চাকরকে ডেকে আমাকে বাগানে নিয়ে যেতে বললেন। ভেলুর কবর দেখে ফিরে আসতেই বললেন, নিজ হাতে এক কোমর কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে ওকে কবর দিয়েছি। আমার গা ব্যথা হয়ে গেছে।

আমি প্রণাম করে সেদিনকার মত বিদায় নিলুম।

বেটু

শরৎদার এক টিয়ে পাখী ছিল—নাম বেটু, সে চোর ধরেছিল। তারপর থেকে তার আদর এত বেড়ে গেল যে, সেটা যে কোন মানব শিশুর ঈর্ষার বিষয় হতো। দুপুরে একদিন দাদা বাড়িতে ছিলেন না, যেমন তিনি থাকতেন না। চাকররাও

কেউ কোথাও নেই, হয়তো বা ঘুমুচ্ছে, এমন সময় এক ঘটি-বাটির ছ্যাঁচড়া চোর ঢুকেছে তাঁর বাড়িতে। বেটু করল কি, চোরকে দেখেই ট্যা ট্যা করে চীৎকার করতে লাগল, আর শেকল ছেঁড়বার চেষ্টা করতে লাগল। তিন-চার বার আপ্রাণ চেষ্টার ফলে ছিড়ে গেল শেকল। আর কি! বেটু গিয়ে চোরের পিঠে, মুখে, মাথায়, যেখানে পারল ঠোকরাতে লাগলো! চোরের পিঠ দিয়ে রক্ত ঝরতে লাগল, চোর বিব্রত হয়ে, কাপড়, ঘটি ফেলেই পালাতে লাগল। বেটুও তার পিছনে তাড়া করছে আর ট্যা ট্যা করে ঠোকর মারছে।

এমন সময় দাদাও বাড়ি ঢুকছেন, চোরের সাথে মুখোমুখী। এরপর থেকে বেটুর যে কত খাতির বেড়ে গেল, তা একদিনের ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। আগেই বলেছি, তাঁর বাড়ির উঠানে একটা পেয়ারা গাছ ছিল। আষাঢ় কি শ্রাবণ মাস, আমি গিয়ে দেখি, গাছ ভরা পেয়ারা পেকে আছে। আমি আর লোভ সামলাতে না পেরে দুটো পেয়ারা পেড়ে নিলুম, একটা তখুনি খেতে লাগলাম, আর একটা পকেটে পুরলুম। শরৎদা আমাকে পেয়ারা খেতে দেখে, ঘর থেকে বেরিয়ে এসে চাকরকে গম্ভীর ভাবে বললেন—সব পেয়ারা পেড়ে ফেল। পেয়ারা পাড়া হলে আদেশ দিলেন, সব পেয়ারা পাড়ায় বিলিয়ে দেও। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলুম। কী অপরাধ করেছি বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম! তিনি বললেন, তুমি না বলে কেন পেয়ারা পাড়লে, না হয় সব পেয়ারা তুমিই

নিয়ে যাও। আমি বললাম, এরকম অবিচার আমার প্রতি কেন করছেন, আমার যে কী অপরাধ তাতো বুঝতে পারলুম না? তিনি বললেন—তাহলে এসো, দেখবে এসো। এই বলে তিনি আমাকে ঘরের ভেতরে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি, তাকের উপর চার-পাঁচটা ছোট ছোট কাঁসার বাটি সাজান। তার মধ্যে আছে বেদানার দানা, কোনটায় আনারসের টুকরো, কোনটায় পেস্তা, বাদাম, কিসমিস। তিনি বললেন—এসব বেটুর খাবার, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বেটু এই সব খায়। বেটুর খাবার আগে এ বাড়ীর ফল কেউ খেতে পারে না। তুমি যখন তার আগে ফল খেয়েছো তখন এগুলো পাড়ায় সব বিলিয়ে দিক্‌গে। আমিও সেই কথা শুনে আমার আধ-খাওয়া পেয়ারা ও পকেটে যেটা ছিল, সেটা জানালা গলিয়ে ফেলে দিলাম। উনি বেটুর কাছে গিয়ে, 'বাবা বেটু!' 'বাবা বেটু!' বলে তার গায়ে হাত বুলিয়ে, ঠোঁটে চুমু খেয়ে, তাঁর মাথাটি গালের সঙ্গে ঠেকিয়ে, যেমন করে ছোট ছেলেকে আদর করে, সে রকম করে আদর করে, তাকে আস্তে আস্তে সব ফলগুলি খাওয়ালেন। তখন তাঁর মন শান্ত হলো। এইটুকু পরিশ্রম করে তিনি বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি ইজি-চেয়ারে গা' এলিয়ে দিয়ে চাকরকে চা' ও তামাকের হুকুম করলেন। এই সময় তাঁর মৌতাতের সময়। সকালে একবার, বিকেলে চারটেয়, পাঁচটায় ও রাত ন'টায়, এই ক'বার তিনি আফিং খেতেন। সেই আফিংএর মাত্রা যদি কেউ দেখতেন, তাহলে তিনি বুঝতে

পারতেন, কোন সাধারণ লোক এতখানি আফিং খেলে মরে যেতো একেবারে। তিনি বলতেন অবশ্য মাত্র দু'আনা করে আফিং তিনি সারাদিনে খেতেন।

তাঁর আফিং খাওয়ার সাথে আমিও একটু জড়িত আছি। প্রথম প্রথম আলাপের পর তিনি একদিন বল্‌লেন, 'ওহে, যদি লেখক হতে চাও, তাহলে একটু আফিং খাওয়া অভ্যাস কর।' কি করি, গুরুজনের কথা অমান্য করি কি করে? আমিও আফিং খেতে লাগলাম। কিন্তু দিন পাঁচ-সাত পরে তাঁর কাছে গিয়ে, আমার আফিং খাওয়ার ফলে কাহিল অবস্থার কথা বললাম। তিনি হেসে বললেন—'ও কিছু না, মিশ্রীর জল, ডাবের জল এই সব খাও সেরে যাবে।' দিন কতক সেই এক্‌সপেরিমেণ্ট চললো—কিন্তু আমার পেটের অবস্থা যথাপূর্ব্বম্। আমি একদিন গিয়ে বললাম—দাদা, আমার ধাতে সইলো না। তিনি হতাশ হয়ে বললেন, তুমি তাহলে কোন দিন লেখক হতে পারবে না। গুরুজনের কথা মিথ্যা হবার নয়। আমার জীবনে আর লেখক হওয়া হলো না। মৌতাতের পর তিনি ধাতস্থ হয়ে আমাকে বললেন—অযথা তোমাকে বকেছি, কিছু মনে করো না। যাঁরা তাঁর সাথে অন্তরঙ্গতার দাবী করতেন, তাঁরাই জানতেন যে বিকেল পাঁচটা হতে রাত ন'টা পর্য্যন্ত তাঁর কাছে থাকলে বোঝা যেতো যে তিনি তখন শিল্পী নন, স্রষ্টা নন, অপরাজেয় কথা-শিল্পীও নন, তিনি মানুষ শরৎচন্দ্র। তাঁর মানবতার এই দিকটা যাঁর দেখবার সুযোগ হয়েছে, তিনিই একথা বুঝতে পেরেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তাঁর এই পশু-প্রীতি তাঁর অবচেতন মনের কোন্ দিক ? তিনি ছোটবেলায় আত্মীয়-স্বজনের স্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিলেন। গোর্কী এক জায়গায় বলেছেন, 'এমনি দুর্ভাগ্য ছিল আমার যে ছেলেবেলায় কেউ একটা পুতুলও আমাকে দেয় নি।' এই এক কথায় গোর্কী তাঁর শৈশবের বেদনাকে ফুটিয়ে তুলেছেন কারণ শিশুর কাছে একটা সামান্য পুতুলের যে দাম, একজন পরিণত বয়স্ক পুরুষের কাছে মোটর কার, আর মেয়েদের কাছে নেক্‌লেস বা ব্রেস্‌লেটের মতই। তিনি সে কথা ভোলেন নি। তাঁর নিজেরও ছেলেপুলে ছিল না। সেইজন্য তাঁর সমস্ত স্নেহরস অযাচিত ভাবে দিয়ে যেতেন পশুপাখীর ওপর। তাদের মূক-বেদনার সাথে, তাঁর লাঞ্ছিত শৈশবের সাদৃশ্য তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন। সেটা তাঁর কত বড় ব্যথা ও বেদনার দিক এই সব ঘটনা থেকে বোঝা যায়।

মজলিশী শরৎচন্দ্র

একবার কী ঘটনায় মনে পড়ে না, বোধ হয় * হেমন্তর নেমন্তন্নে দাদা কৃষ্ণনগর গিয়েছেন। সঙ্গে দল ভারী। পবিত্র ছিল কিনা আমার মনে নেই। এক একবার মনে হচ্ছে পবিত্রও ছিল।

* কল্যাণীয় শ্রীমান হেমন্তকুমার সরকার

আমার এখনও মনে পড়ে, সকাল থেকে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেল, গানের মজলিশ সমানে চলেছে। * দিলীপ সেদিন গেয়েছিলেন 'রাঙা জবা দেব পায়'—কত ভাবে কত মীড় দিয়ে যে ঐ এক কলি গেয়েছিলেন—আমি তা' আজও ভুলিনি। তারপর † নলিনীর গান। সে এক প্রাণ মাতানো ব্যাপার। তার গান শুনে বাইরে থেকে লোক ছুটে আসতে লাগলো, তারপর ‡ কাজী। গৃহস্বামী যে কতবার খাবার তাগিদ দিয়ে গেলেন তার শেষ নেই। সন্ধ্যায় মজলিশ ভাঙলো—মানে হাফ-টাইম অবকাশ হলো, তখন খাওয়া হলো। তারপরই আবার স্থুরু হলো—রাত বারটা। দাদা সমানে বসে শুনছেন।

আর একবার দাদার সাথে নবদ্বীপ যাই। সাল তারিখ মনে নেই। তবে জ্যৈষ্ঠ মাস মনে আছে। কারণ আম খেয়েছিলাম। এই নবদ্বীপ যাওয়ার একটা ইতিহাস আছে। দাদার লেখা পড়ে খুব আকৃষ্ট হয়ে দিল্লী থেকে এক মহিলা তাঁকে চিঠি লেখেন, দাদা, একবার দেখা করতে এসো। মহিলাটি তখন অসুস্থ। দাদা করলেন কি, দিল্লীতে কৈ, মাগুর মাছ পাওয়া যায় না, একেবারে কলিকাতা উজাড় করে, কৈ, মাগুর মাছ জালায় ভরে দিল্লী চললেন।

তার পরের ঘটনা। কি সূত্রে জানিনা, মহিলাটির স্বামী বদলী হয়ে নবদ্বীপ এসেছেন—দাদা যাচ্ছেন সেখানে, আমি তল্পী-বাহক।

---

* শ্রদ্ধেয় দিলীপ কুমার রায়। † বন্ধুবর নলিনীকান্ত সরকার। ‡ কাজী নজরুল।

আমরা বোধ হয় দশটার সময় নবদ্বীপ গিয়ে পৌঁছলাম। ষ্টেশনে মহিলাটির স্বামী আমাদের অভ্যর্থনা করতে এসেছেন। তিনি ভাড়াটে গাড়ী করে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাড়ি পৌঁছেই আমি হলুম—দাদার ভাই, মহিলাটির ঠাকুরপো। আর আমাকে পায় কে! মহিলার চেহারায় কোন বৈশিষ্ট্যের ছাপ ছিল না, কিন্তু এত স্নেহশীল যে তাঁর আদর-যত্নের কথা আমি কোন দিনই ভুলিনি। শরৎদা নবদ্বীপ এসেছেন—সে এক রৈ রৈ ব্যাপার। কোথায় বুড়ো শিবতলা, কোথায় পোড়া মা তলা, কোথায় সোনার গৌরাঙ্গ, সকলের বাড়িতে চা' পান, খাবার খাওয়া, গল্প আর আড্ডা দিতে দিতে রাত ন'টা হয়ে গেল। দাদাকে কেউ ছাড়তে চায় না। কি করি, নতুন বৌদিকে কথা দিয়েছি, যে করেই পারি, দাদাকে সকাল সকাল বাড়ি নিয়ে আসবো। তারপর সকলের অনুরোধ ঠেলে দাদাকে একরকম জোর করেই প্রহরখানেক রাতে বাড়িতে আনা গেল। বৌদি রান্না-বান্না সেরে ঘর-বার করছেন। বাড়িতে আর দ্বিতীয় পুরুষ নেই। তাঁর স্বামীও আমাদের সাথী। দুটি ছোট ছেলে-মেয়ে, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। মহিলাটি একা রাতের খাবারের কি বিরাট আয়োজনই করেছেন! আমাদের পরিতোষ করে খাইয়ে তিনি নিজের হাতে আমার ও দাদার পাশাপাশি বিছানা করে মশারী খাটিয়ে দিলেন ঘরের মধ্যে। একতলা বাড়ি, বারান্দা আছে। পাশের ঘরে তাঁরা ছেলে-মেয়ে নিয়ে থাকেন। বড্ড গরম—দাদা আমাকে শুতে বলে

নিজেই এসে তাল পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন—কিছুতেই শুনবেন না। শেষে নতুন বৌদি তাঁর হাত থেকে পাখা কেড়ে নিয়ে বাতাস করতে লাগলেন ; রাত তখন দুপুর গড়িয়ে গিয়েছে। আমি কখন ঘুমিয়েছি জানি না। ভোরে উঠে দেখি, তাঁরা দু'জন বারান্দার বেঞ্চিতে বসে গল্প করছেন। বিছানা দেখে মনে হলো —দাদা শুতে আসেননি, সারারাত গল্প করেই কাটিয়েছেন। এই দেখে আমার ভবভূতির একটা লাইন মনে পড়লো—

তরুণ রাম সীতাকে সবে বিয়ে করে নিয়ে এসেছেন—কপোলে কপোল ঠেকিয়ে তাঁরা সারারাত গল্পই করছেন, গল্পই করছেন, কথা আর শেষ হয় না, কিন্তু রাত ভোর হয়ে গেল। আমার শেষ লাইনটা মনে আছে—'রাত্রিমেব ব্যরংশীত'—রাতই কেটে গেল। যদিও ঐ গল্পের টেক্‌নিকের সাথে প্রথম অংশের কোন মিল নেই, কিন্তু শেষটায় হুবহু মিল দেখে শ্রদ্ধায় আমার মন ভরে গেল।

আমি উঠে গিয়ে তাঁদের প্রণাম করলাম। বৌদি হেসে বললেন—কী ভাই! তোমার কেমন ঘুম হলো ? তুমি জান না—উনি আরো দু'বার উঠে গিয়ে তোমাকে বাতাস করেছেন। কাল যা' গুমোট গিয়েছে।

তারপর বিদায়ের পালা। যেমন বিদায় বেলা মামুলী মনের ভাব যা হয়ে থাকে—মন ভারাক্রান্ত, বার বার আসার প্রতিশ্রুতি কিন্তু আসা আর হয় না। বৌদি দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আঁচল দিয়ে চোখ মুছছেন, দাদা গাড়ী থেকে তাই দেখে মুখ ফিরিয়ে

জোরসে একটা সিগারেট ধরালেন—গাড়োয়ানকে হুকুম দিলেন, হাঁকাও জলদী, ষ্টেশন।

শিল্পী ও তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র

চন্দ্রমুখী

তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের সম্বন্ধে সব কথা বলা সম্ভব নয়। সব চরিত্রগুলিই তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বাস্তবরূপ। যে কটি চরিত্র সম্বন্ধে তিনি কথা প্রসঙ্গে নিজের থেকে আভাস-ইঙ্গিতে যা' বলেছেন, আমি তারই সম্বন্ধে কিছু বলবো। প্রথমে চন্দ্রমুখীর চরিত্রই নেওয়া যাক। কী ভাবে ঘটনাধীন কোন বন্ধুর মুখ থেকে শুনে তাঁর মনে এই চরিত্রের আভাস এসেছিল, তাঁর নিজের মুখে যা শুনেছি, সেই কথাই বলবো।

শুনতে ঠিক রূপকথার মত, হয়তো সত্য হতে পারে, আবার সত্য নাও হতে পারে—তবে একেবারে নিছক কল্পনা নয়।

কোন দুই বন্ধুতে উত্তর কলিকাতার এক পল্লীতে পান ভোজন করতে গিয়েছিলেন। তখনকার দিনে কলিকাতায় সাহেবী হোটেল ছাড়া—ক্যাসোনেভা বা চাঙ্গুয়া হয় নি, যে ইচ্ছা করলেই বন্ধু-বান্ধব নিয়ে পান ভোজন করা যেতে পারে। খুব পুরো দমে পান ভোজন চলেছে, নাচ-গানও চলেছে। সুর ও সুরার নেশায় তখন তাদের চিত্ত মশগুল। বন্ধুর কাছে নগদ তিন হাজার টাকা আছে, তাঁর সে খেয়াল নেই। গুণ্ডারা কেমন করে এই টাকার সন্ধান পায়—আর যায় কোথায়?

চারিদিক থেকে বাড়ি ঘিরে,—ঘরে ঢুকে টাকা লুঠ করবার মতলব করল তারা। মেয়েটি তাই বুঝতে পেরে—দোর বন্ধ করে দিল। বন্ধু দু'টি তখন নেশায় অচেতন। সকালে যখন ঘুম ভাঙ্গলো,—যাঁর টাকা তিনি বললেন, আমার টাকা কি হলো ?

মেয়েটি বললে, আমি কি জানি ? তোমরা ঘুমুলে গুণ্ডারা বাড়ি ঘেরাও করে টাকা লুটে নিয়ে গেছে। সেই ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন—টাকা তাঁর নিজেরও নয়, কোন মহাজনের। এ টাকা দিতে না পারলে তাঁর জেল হবে। তিনি নিজে এ টাকা কখনও পূরণ করতে পারবেন না। শেষে তিনি কাঁদতে সুরু করে দিলেন। তখন মেয়েটি করে কি ? নিজের কোমর থেকে টাকার থলিটি খুলে দিল—সারারাত মেয়েটি টাকা কোমরে বেঁধে বালিশ চাপা দিয়ে শুয়েছিল—

দাদাকে বলতে শুনেছি, এই ঘটনায় আমার একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী খুলে গেল। যে নারী পাঁচ টাকার জন্য দেহের পণ্য করে, নিজের খোরাক জোগায়, সেই নারী কি করে তিন হাজার টাকার লোভ সামলাতে পারল ! নারীর অবচেতন মনের এটা কোন্ দিক ? এ দিকটা তো আমরা দেখি নি। আমরা বাইরে নারীর যেরূপ দেখি, সেটা সত্য নয়। তার অন্তরে একটা গভীর অনুভূতির দিক আছে, সেটা আমাদের চোখে পড়ে না। যেটা চোখে পড়ে, সেটা তাদের আত্মপ্রবঞ্চনা। কোন গভীর দুঃখে, হয়তো বা কোন আঘাতে, হয়তো বা কোন অবস্থার ফেরে

তারা এসেছে এই পথে। জীবনের চোরাবালিতে তাদের ছন্দ ও গতি বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু সেটা অন্তঃসলিলা ফল্গু নদীর মতোই তাদের অন্তর প্লাবিত করে দিচ্ছে নারীর লাঞ্ছিত মর্য্যাদা। তিনি তাকে অপরূপ রূপ দিলেন—চন্দ্রমুখীর চরিত্র পরিকল্পনায়। শুধু বাংলা বা ভারতীয় সাহিত্যে নয়, আন্তর্জাতিক সাহিত্যেও এর তুলনা মেলে না। 'এ্যানা কারনিনার' চরিত্র অন্য রকমের। গভীর আঘাত-অবিচারে তার চিত্ত বিমুখ হয়েছিল—পুরুষের প্রতি। তার প্রতি যে অন্যায় করেছিল—সে অপরিসীম ত্যাগ ও দুঃখ বরণের ভেতর দিয়ে তার চিত্ত আবার জয় করেছিল। চন্দ্রমুখীর সাথে তুলনা করতে হলে—ডষ্টোভয়েস্কির 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট' (অপরাধ ও শাস্তি) এর সোনিয়ার সাথে তুলনা চলে। তবে চন্দ্রমুখী সোনিয়ার চাইতেও বড়। সোনিয়া ছিল বালিকা, তার অন্তরের প্রেরণা ছিল—ধর্ম্মের প্রতি প্রীতি ছিল, যিশুর প্রতি প্রেম ছিল।

চন্দ্রমুখী যুবতী! প্রেম, ভালবাসা বা ধর্ম্মের কোন ধারই ধারতো না—দেবদাসের প্রত্যাখ্যানে তার অন্তরের সুপ্ত লাঞ্ছিত নারীর মানবীয় মর্য্যাদা জেগে ওঠে। সে আকাশের দিকে চেয়ে—চাতক পাখীর মত আকাশ থেকে ভগবৎ প্রেমের করুণা ভিক্ষা করে নি। সে রক্ত-মাংসে গড়া মানবী, সে নিজের চেষ্টায় তার অবচেতন মনের লাঞ্ছিত নারীত্বকে জাগ্রত করে সত্যিকার মানবী হয়েছিল।

অনুরূপ একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত এখানে দিলে হয়তো অবান্তর

হবে না। এইজন্য বলছি যে, লাঞ্ছিত নারীর মর্য্যাদা কখন কি ভাবে তার নারীত্বে অভিব্যক্ত হয় কেউ বলতে পারে না।

ঘটনা বোধ হয় ইং ১৯২৬ সালের শীতের এক সন্ধ্যায়। স্থান—লক্ষ্ণৌ আমিনাবাদের এক হোটেলের কক্ষ। শীতের এক সন্ধ্যায় আমি আমিনাবাদের এক হোটেলে গিয়ে উঠলুম। উঠেই বললুম—আমি ঠুংরী শুনতে চাই। হোটেলের ম্যানেজার একের পর এক তিনজন নামজাদা শ্রেষ্ঠ ঠুংরী গাইয়ে এনে হাজির করলেন। আমার কোনটাই পছন্দ হলো না। শেষে এলো একটি মেয়ে—দুধে-আলতা গায়ের রং, হাত মেহুদী পাতায় রঙীন—চুল এক বেণীতে বাঁধা, পরনে পেশওয়াজ, কাঁচুলী ও ওড়না—চোখে সুরমা ; ঠোঁট লাল টুকটুকে।

আমি বললুম—এর বয়স কতো ? মেয়েটি তা' বুঝতে পেরে বললে—"দো'শো' বরষ—"

আমার ভুল বুঝলুম—মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নেই। মেয়েটি, আমার মুখের কথা আমাকে ছুড়ে মারলে। আমি বললুম—আমি এরই গান শুনবো। হোটেলের ম্যানেজার সব বন্দোবস্ত করে দিলেন—এলো তবলচি, এলো সারেঙ্গী। গানের আসর বসে গেল।

মেয়েটির দিকে আমি চেয়ে বললুম—তোমার এমন লাল টুকটুকে ঠোঁট, একটা চুমো খেতে দেবে ? মেয়েটি লক্ষ্ণৌর চোস্ত-উর্দ্দু ও তার চাইতে বেশী চোস্ত কায়দায় বললে—পারলে নিজেকে বাধিত মনে করতুম, তবে আমার ঠোঁটে ঘা। তবে

বাবু, তোমার মনের দুঃখ রাখবো না—আমি গানে-গানে তোমার তৃষ্ণা মিটিয়ে দেবো। আমি বললুম—বেশ তাই হোক। তারপর সে গাইতে লাগল ঠুংরীর পর ঠুংরী। রাত বারোটা কখন বেজে গেছে—তখনও সমানে চলেছে তার ঠুংরী। আমি তখন সুরের নেশায় মাতাল হয়ে গেছি। যখন রাত শেষ হয়েছে, পূবের দিকে শুকতারা দব্ দব্ করে জ্বলছে, তখন সে বললে—বাবু, একঠো ভৈরোঁ শুনিয়ে।

সে আরম্ভ করলে ভৈরবী। আমি সে ভৈরবীর সুর কখনও ভুলবো না, সুরের কী বিচিত্র ঝঙ্কার! যেন মেঘের মধ্যে সুর জমাট বেঁধে গেছে; ভোর হয়েছে, তখন চেয়ে দেখি কখন তবলচি, সারেঙ্গী সব ঘুমিয়ে পড়েছে। ভোর পর্য্যন্ত সুরের ঝর্ণা সমানে চলেছে, তার সাথে সাকী, সামনে এই ঈরাণী তরুণী, আমার মনে হলো—আরব্য উপন্যাসের একখানা ছেঁড়া পাতা—হাজার রাতের এক রাত আমার জীবনে এসেছিল। সামনে এই তরুণী, অজস্র সুরের স্রোত, যেন ঈরাণের সমস্ত দ্রাক্ষাকুঞ্জ তার মধ্যে উজাড় করে নিংড়ে দিয়েছে। চোখে তার মদালেশ, আমার শিরায় শিরায় তখন আগুন জ্বলেছে। কিন্তু তার ঠোঁটে ঘা, ছুঁতে পারবো না। ভৈরবী শেষ করে, আমার হাত ধরে সে বারান্দায় নিয়ে এসে বললে—বাবু! এইবার একটা চুমো খেয়ে আমাকে পুরস্কার দাও। আমি বললাম—সে কী করে সম্ভব? তখন সে খিলখিল করে হেসে উঠলো—আমার মুখের উপর যেন সমস্ত আরবের সুগন্ধির এক ঝলক গরম হাওয়ার লূ বয়ে গেল।

সে বললে—বাবু, তোমরা জান না, এই রকম গান গাইতে এসে আমাদের যে কত অত্যাচার সইতে হয়। গান তো হয়ই না, আমাদের দেহের উপর নানারকম পীড়নের চেষ্টা চলে—আমাদের মর্য্যাদা রাখা দায় হয়। তাই আমরা ঐ কথা বলে মুখ বন্ধ করি। কিন্তু দেখলুম, তুমি দরদী, তোমার ভেতরে সুরের আগুন আছে, তাই বলছি, এইবার তুমি আমাকে পুরস্কার দাও। তখন সকাল হয়ে গেছে, তবলচিরা এসে বললে—এবার যেতে হবে। আমি তাকে টাকা দিতে গেলাম, সে নিলো না; ঝরঝর করে কেঁদে বললে—বাবু! আমি তোমার কাছে কিছু নেবো না। তুমি যখনই লক্ষ্ণৌ আসবে আমি তোমাকে গান শোনাবো। তারপর আমি বহুবার লক্ষ্ণৌ গেছি—দোশো' বছরের শাশ্বতী তরুণী শিল্পীর সন্ধানে। কিন্তু তাকে খুঁজে পাই নি।

দাদার মুখে চন্দ্রমুখীর চরিত্র পরিকল্পনার ইতিহাস শুনে আমি দাদাকে এই কথা বলেছিলাম। দাদা তখন শুধু হেসে-ছিলেন। কিন্তু আজ দেখছি, এই অপরাজেয় শিল্পী লাঞ্ছিত নারীত্বকে চন্দ্রমুখীর চরিত্রে যে অপরূপ সুষমায় ভরে দিয়েছেন, পাটনার পিয়ারী বাইজীকে রাজলক্ষ্মীতে রূপান্তরিত করেছেন, কিন্তু কৈ আমি এই দুশো বছরের শাশ্বতী তরুণী শিল্পীকে তো কোন রূপই দিতে পারলুম না। এখানে আচার্য্য শিল্পী অবনীন্দ্র-নাথের কথা মনে পড়ে—কে সেই আশ্চর্য্য শিল্পী, যিনি রাজহংসীকে ধবল করেছেন, যিনি ময়ূরকে নানা রঙে রামধনুর ব:র্ণ চিত্রিত করেছেন?—ময়ূর চিত্রিত যেন রাজহংসী ধবলীকৃত!—সেই

শিল্পীগুরুকে নমস্কার। এই শিল্পীগুরুও কত অজানা, অখ্যাত, লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত জীবনকে এমভিাবেই কথার মায়াজালে রূপ দিয়েছেন। এই আশ্চর্য্য জীবনবাদী সেটা অনুভব করেছিলেন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের বাস্তবতার অনুভূতি দিয়ে।

কমল

শেষ প্রশ্নের কমল শিল্পীর অভিনব সৃষ্টি! কমল একদিক দিয়ে দেখলে—চরিত্র নয়, একটা মতবাদ, একটা শাশ্বত প্রশ্ন—সমস্যা, যার সমাধান শিল্পী দেন নি, সমাধান ছেড়ে দিয়েছেন, পাঠকদের কাছে। পাঠকরা এই প্রশ্নের সমাধান নানাভাবে করেছিলেন—বেশীর ভাগ গালাগালি দিয়ে, আর যাঁরা বুঝতে পারেন নি, তাঁরা অবিশ্যি শিল্পীর প্রশংসা করেছিলেন। গল্পে কোন প্লট নেই—কতকগুলো মতবাদের বিক্ষিপ্ত ঘটনা, কতকগুলো মতবাদের যাচাই চলছিল—কমলকে দিয়ে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কমল কে?

কমল গোরার বিপরীত ভাবধারা, যাকে বলে antithesis. গোরা সাহেবের ছেলে—পালিত হলো গোঁড়া হিন্দু পরিবারে। পশ্চিমের মতবাদ, আচরণ তার কাছে মিথ্যাচার। সে যেন যাহা ভারতীয়, যাহা প্রাচ্য—সবের জীবন্ত প্রতীক। এক কথায় বলতে গেলে জ্বলন্ত হোমশিখা—ভারতীয় সমাজের টিকি ও তিলকের মর্য্যাদার তুলনা সে সারা দুনিয়ায় খুঁজেও পায় না।

কমলের কথা বলতে গেলে—তার মায়ের রূপ ছিল, রুচি ছিল

না। তার নিজের মায়ের সম্বন্ধে একথা বলতে তার এতটুকু বাধে নি। তার বাপ ছিল চা-বাগানের এক সাহেব—অবিশ্যি তার শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে এক কমলের মুখে শোনা যায়, সে খুব শিক্ষিত ছিল। শিক্ষার দৌড় তার কত দূর, তা' অবিশ্যি কমল বলে নি—অক্সফোর্ড কেমব্রীজের পাশ করা অবিশ্যি সে ছিল না—সাধারণ চা-বাগানের সাহেব, যে কুলী ঠেঙায়, কত সুন্দরী কুলী-রমণী যার লালসায় হয়তো নিজেদের বলি দিয়েছে। তবুও তার বাপের প্রতি কমলের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ছিল। এ হেন কমলকে দিয়ে শিল্পী বর্ত্তমান মতবাদের যাচাই ক'রে ভাল, না মন্দ করেছিলেন ? কারণ কমলের মতবাদের দাম কতটুকু ?

আমরা বলবো দাম আছে। ভারতীয় সমাজের পায়রার খোপের মত নির্দ্দিষ্ট খুপরী করা সমাজে যেখানে যৌন-সম্বন্ধ কেবল নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, সেখানে চা-বাগানের উচ্ছৃঙ্খল বা উদ্ধত এক সাহেবের মেয়ে—সে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভারতের অতীত সমাজকে দেখেছে, তার সাথে তার চোখে দেখা পরিচয় ছিল না, সে হয়তো তার কথা শোনেও নি, সে যা বলেছে, সেটা তার নিজস্ব অনুভূতির দিক দিয়ে, যেন যুগধর্ম্ম তার মনে কাজ করেছে তার অলক্ষ্যে, সে জানেও না কিভাবে। এইখানেই শিল্পীর বিশেষত্ব। একটা অবচেতন যুগ-ধর্ম্মকে তিনি চেতনা-মুখর করলেন এই নারীর মধ্য দিয়ে—তবে তাকে তিনি স্পর্শ-কাতর করেন নি। সে কোন আঘাতকেই ভয় করে না, বর্ত্তমানকে সে মেনে নেয় না বিনা বিচারে, ভবিষ্যতের

আশায় সে কল্পনার রঙীন জাল বুনে না—তত্ত্বের বা ভাবধারার দিক দিয়ে এইটুকু বলা যেতে পারে।

জীবনের দিক দিয়ে দেখলে দেখা যায়, কমল রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ—নিতান্ত মানবী। দেবীত্বের স্পর্দ্ধাও রাখে না—সেটাকে সে উপহাসই করে, যেহেতু সেটাকে সে দেখেনি।

হরেন এমন বহুমুখ হয়ে নীলিমার প্রশংসা করলে যে এমন দেখা যায় না। স্ত্রী মারা গেলে বিধবা শ্যালিকা—অবিশ্যি সুন্দরী ও যুবতী—মাতৃহারা শিশুদের ভার নিজ হাতে নিয়ে পরের সংসার নিজের ঘাড়ে তুলে নিলেন। এ দেবী ছাড়া মানবীতে পারে না, যেহেতু দেবীর নিজের স্বার্থ বলে এখানে কিছু নেই। কমল হাসলো। পরে বললে, ঠিক এই রকম একটা ঘটনা আমি আসামে চা-বাগানে থাকতে দেখেছিলুম। ভাইয়ের স্ত্রী মারা গেছেন। শূন্য বৌদির স্থান পূরণ করতে দাদা তাঁর যুবতী বিধবা বোনকে বাড়ী এনে, কেঁদে তার কোলে নিজের ছোট শিশুকে তুলে দিয়ে বললে, ধর নে, তোর ছেলে। একে মানুষ করে এর মুখ চেয়েই তুই দিন কাটাবি। এই তোর সব।

হরেন বললে—নয়তো কি? কমল হেসে বললে—পুরুষের এত বড় স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না। আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেবার জন্য সে অবতারণা করলে—হিন্দু সমাজে বহুকালের চলিত নারীর সতীত্বের দৃষ্টান্তের মিথ্যা এক ছলনার কথা। নারীর মর্য্যাদার অবমাননা। সে যুগে নাকি কোন কুষ্ঠ ব্যাধি পঙ্গু রোগী স্বামীকে তার স্ত্রী সেই স্বামী মহাশয়ের ইচ্ছামত

কোলে করে তার অভিলষিত গণিকার বাড়ি পেঁ াছে দেয়। এ গল্প কাল্পনিক—সত্য হতে পারে না। অথচ এই কাল্পনিক গল্পকে আশ্রয় করে যুগে যুগে হিন্দু সমাজ নারীর দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতো, যদি সতী হতে হয়, তবে এই রকম হতে হবে।

কমলের উপমা শুনে হরেনের মুখ চূণ হয়ে গেল—তবুও হরেন বললে, তাহলে স্বার্থত্যাগের কোন মূল্য নেই ?

কমল বললে—নীলিমা দেবী কোন স্বার্থ ত্যাগ করেন নি। নিজে তিনি আরো স্বার্থে জড়িয়ে পড়েছেন। আর তাঁকে দেবীত্বের যে প্রলোভন দেখান হচ্ছে, সেটা পুরুষের সনাতন প্রবৃত্তি—নারীকে বঞ্চনা ছাড়া কিছু নয়। হলোও তাই ! এই মহীয়সী দেবীকে ত্যাগ করে অবিনাশ লাহোরে গিয়ে বিয়ে করল।

শিল্পী আশুবাবুকে কেন্দ্র করেই যত কথার মায়াজাল বুনেছেন। আশুবাবু বৃদ্ধ, শিক্ষিত, অর্থশালী, বিলেত-ফেরত। আশুবাবু বিপত্নীক। তাঁর স্ত্রী মারা যাওয়ার পর তাঁর মৃতা স্ত্রীর স্মৃতিকে সম্বল করে আদর্শ জীবন যাপন করছেন। কমল এ আদর্শবাদ একদিন ভেঙ্গে দিল। কমল বললে, এই মিথ্যা আদর্শবাদ দিয়ে হিন্দু সমাজ তার বিধবা নারীদের কী না লাঞ্ছনাই করছে ও তাঁদের ন্যায্য পাওনা থেকে চিরদিন বঞ্চনা করছে !

সকলে হা হা করে উঠলেন—সে কি কথা ? তুমি ম্লেচ্ছ ও তারপর যে সব বিশেষণ কমলের প্রতি তাঁরা প্রয়োগ করলেন, তা লেখা যায় না।

কমল শান্তভাবেই বললে—আমাকে গালাগালি আপনারা দিতে পারেন তাতে কিছু আসে যায় না, কিন্তু যাঁদের দেবী বলে চালাতে যাচ্ছেন সেটা মানব-ধর্ম্মের বিরোধী। নারীদের পক্ষে ওটা কল্যাণের তো নয়ই, বরং তাদের এ পর্য্যন্ত অসম্মানই আপনারা করে আসছেন—জোর করে তাদের ঘাড়ে এই মিথ্যা আদর্শবাদ চাপিয়ে।

—এই আদর্শ মিথ্যে ?

—হাঁ, মিথ্যে।

—কিসে ?

—কিসে নয় বলুন ? যে জিনিষের অস্তিত্ব নেই, তার কাল্পনিক স্মৃতি নিয়ে জীবনযাত্রা চলে না। জীবনের স্রোত মিথ্যার চোরা-বালিতে আটকে যায়।

অমনি অবিনাশ, হরেন্দ্রর দল হা হা করে বললে—তবে কি আশুবাবুর জীবন মিথ্যাচার ?

কমল বললে—বিয়ে করা, না-করার মধ্যে অনেক কিছু কারণ থাকতে পারে—দৈহিক, মানসিক।

আশুবাবু বললেন—আমার যখন স্ত্রী মারা যান, তখন আমার বিয়ের বয়স ছিল, বুঝলে কমল মা! তবুও বিয়ে করিনি মনোরমার মুখ চেয়ে।

কমল হেসে বললে—ঠিক কথা, আশুবাবু! মেয়ের বিমাতা হওয়া মেয়ের কাছে দুঃখের, এতে আপনার কন্যার প্রতি স্নেহই বোঝায়, মৃতা পত্নীর প্রতি প্রেমের স্থান এর মধ্যে নেই।

—নেই ?

—না, নেই।

সকলের সামনে বোমা পড়লেও এত বিস্মিত তাঁরা হতেন না, যখন তাঁদের আজন্ম সংস্কারে ঘা লাগলো। কমল হেসে বললে—মানুষ সংস্কারের মোহে নিজের বিচার-বুদ্ধি আচ্ছন্ন করে রাখে—নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না। তখন বুঝতে হবে, সে তখন মরে গেছে। এ-নিয়ম ব্যক্তিগত ভাবে যেমন সত্য, জাতিগত ভাবে তেমনি সত্য।

আর কেহ কোন কথা বললেন না—তাঁদের মনে কমলের কথা গভীর ভাবে নাড়া দিতে লাগল।

এই সে কমল! শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি। নারীর জীবনে যেখানে যত গরমিল, যত সংঘাত, যুগ-যুগান্তের যত লাঞ্ছনা-বঞ্চনা পুঞ্জীভূত ছিল, কমল সবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে, আজ সে নতুন যুগের নারী-দেহ ও মন নিয়ে এসেছে। সে কল্পনা নয়, সে বাস্তব।

তার রক্ত-মাংসে গড়া এই বাস্তব জীবনের একটু পরিচয় দেওয়া যাক। শিবনাথ পাথর কেনবার অজুহাতে কমলকে ছেড়ে এসেছে—অথচ আগ্রার বাইরে যায়নি; আগ্রাতেই আছে ও আশুবাবুর বাড়িতে গানের আসর রোজ জমাচ্ছে। কমল তা জানে। তাদের বিয়ে নিয়ে যখন সকলে ইঙ্গিত করলেন, এটা বিয়েই না, এতে ফাঁক আছে; কমল বললে—ফাঁক থাকাই ভাল, ইচ্ছা মত বেরিয়ে আসা যাবে। সকলে বললেন—কী

কুরুচিপূর্ণ কথা! কী স্বৈরাচার! কমল বললে—যদি ভালবাসাই না থাকে, মিথ্যা বাঁধন দিয়ে তাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম। আমি তা' করবো না।

একথাগুলো হচ্ছিল তাজমহলের প্রাঙ্গণে—সকলে জটলা ক'রে। পরে শিবনাথের দিকে চেয়ে বললে—কী গো, যদি তেমনি দিন আসে, তাহলে মিথ্যা আচারের অজুহাত দিয়ে তোমাকে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করবো না। হলোও তাই! শিবনাথের গা-ঢাকা দিবার পর একদিন সে দাঁড়িয়েছিল তার বাড়ির সামনে—একা সঙ্গীহীন! এমন সময় অজিত মোটর নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছে। সে নিজ হাতে অজিতকে ডেকে গাড়ি থামিয়ে বললে—আমাকেও নিয়ে চলুন, অনেকদিন মোটরে বড়াইনি।

চললো তারা—উদ্দাম গতিতে, তাতেও কমলের তৃপ্তি নেই। সে বলছে, জোরে, আরো জোরে চালান। যেন বর্ত্তমান যুগের যত গতি বেগ তার মধ্যে জমাট বেঁধে ছিল, আজ খোলা পেয়েছে। মাঝ পথে গাড়ি থামিয়ে, সে দোর খুলে এসে বসলো অজিতের পাশে। চলেছে তারা পাশাপাশি বসে উল্কা বেগে—জন-বিরল শহরতলী দিয়ে। এ সময় নরনারীর সুপ্ত যৌন-কামনা স্বাভাবিক।

কমল বললে—চলুন আমরা চলে যাই, যেদিকে হোক।

অজিত বললে—টাকা নেই তো।

—মোটরখানা বেচে দিন।

আঁধার ঘরে সাপ দেখলে যেমন লোকে ভয় পায়, অজিত তেমনি আঁৎকে উঠলো। তার সব ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা নিমেষে উবে গেল। সে বললে—তা' কি করে হয়? পরের জিনিষ।

—আশুবাবু সেটা বুঝবেন।

অজিত বললে—সেটা হয় না। পরের জিনিস আমি নিতে পারবো না।

কমল হেসে বললে—তবে গাড়ী ফেরান। বাড়ি চলুন। পরের জিনিষ যদি নিতে না পারেন, তবে আপনাকে দিয়ে এ-কাজ হবে না।

অজিত এ-শ্লেষ বুঝলো না। যে অজিত একটু আগেই কমলকে নিয়ে উধাও হতে চেয়েছিল, কেবল টাকা ছিল না বলেই পারে নি, কমল তাকে চাবুক মেরে বুঝিয়ে দিল, যাকে নিয়ে সে উধাও হতে চেয়েছিল, সে-ও পরের জিনিষ—শিবনাথের স্ত্রী।

এই ঘটনার পর অজিতের সাথে আর কমলের দেখা নেই কিছুদিন। কমল জানতে পেরেছে, অজিত হরেন্দ্রদের আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে ও সনাতন ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শকে নিজের একমাত্র আদর্শ বলে মেনে নিয়েছে। কমল মনে মনে হাসল। আশুবাবুর ওখানে কমলের সাথে অজিতের দৃষ্টি বিনিময়ই হয়—কোন কথা হয় না। শেষে একদিন সে কমলের কাছে এলো—সে-রাতের ঘটনা যে একটা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ এ-কথাই সে বারে বারে কমলকে বোঝাতে চাইল।

কমল বললে—বিদ্রূপ কোন্‌টা বলছেন ?

—তোমাকে নিয়ে চলে যাবার কথা।

—সেটা বিদ্রূপ নয়, অন্ততঃ আমি বিদ্রূপ করি নি।

অজিত সবিস্ময়ে বললে—তাহ'লে তুমি সত্যিই যেতে ?

—যেতুম।—বলতে কমলের এতটুকু বাধলো না।

অজিতের সংশয় তবু গেল না—সে আদর্শবাদের উপমা দিয়ে বললে—ভালবাসা আমাদের হৃদয়কে উন্নত করে, নিত্য নতুন রসে জীবনকে অভিসিক্ত করে; আর রূপের মোহ আমাদের বুদ্ধিকে, চেতনাকে মোহাচ্ছন্ন করে।

—করেই তো।

—যেটা চেতনাকে মোহাচ্ছন্ন করে তাকে তুমি ভাল বলো ?

—ভাল বা মন্দ আমি কিছুই বলি না, তবে যেটা ক্ষণিকের সেটাকেও আমি বাদ দিই না।

—বাদ দাও না ?

—না। পরে কমল সহজ ভাবে বললে—ক্ষণিকের আনন্দ স্মৃতি-ভাণ্ডারে জমা থাকে, তাকেও উপেক্ষা করা চলে না। তাহলে জীবন পঙ্গু হয়ে যায়।

এরপর শিল্পী এনেছেন রাজেনকে। এই রাজেনের কাছেই বর্ত্তমান মতবাদ বা কমল-তত্ত্ব প্রথম ধাক্কা খেলো। কমল রাজেনকে বললে—আমার বন্ধুত্ব তোমার কাম্য হোক। একদিন দেখো, তোমার কাজে লাগবে।

রাজেন সহজভাবে বললে—কী কাজে লাগবে? আগে না জেনে, আমি তোমার সাথে বন্ধুত্ব স্বীকার করতে পারি না।

—পারো না?

—না।

—বন্ধুত্বের কি কোন দাম নেই?

—অন্ততঃ আমার কাছে নয়, যদি না সে বন্ধুত্ব আমার কর্ম্মজীবনে সহায় হয়।

—কেন? মনের মিলের কি কোন দাম নেই?

—না, ওটা মিথ্যে কথা। আমার কাছে কাজের মিলই মিল। মনের মিল একটা নিছক ভূয়ো কথা—আত্ম-প্রবঞ্চনা ও মনের বিলাস।

কমল স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে ভাবতেও পারে না, তার মত সুন্দরী, শিক্ষিতা যুবতীর বন্ধুত্ব এই যুবক এক টান মেরে পথে ফেলে দিতে পারে!

তবে পরাজয়ের গ্লানি তাকে পেতে হলো না। সে রাজেনের সাথে সহজ সৌভ্রাত্বে আবদ্ধ হ'লো ও তার সাথে সে তার মুচীপাড়ায় রোগীদের শুশ্রূষার তদারকে চলে গেল। কিন্তু সে পারল না। সে মনে-প্রাণে বুঝলো—নরনারীর যৌন-কামনার উপরেও কিছু আছে। সেটা আশুবাবুদের শুষ্ক, মৃত মতবাদ নয়, অহেতুক অতীতের উপর প্রীতি নয়—সেটা হচ্ছে জীবনের আশ্চর্য্য-বোধের আর একটা অবচেতন দিক; যেটা সে এতদিন দেখেনি—সেটা সেবাব্রতীর কর্ম্মময় জীবন।

কমলের আর একটা দিক শিল্পী দেখিয়েছেন—কমলের প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর হতেই সে মালসায় চাল-ডাল সেদ্ধ করে আলু-সেদ্ধ দিয়ে খায়। এ-নিয়মের তার ব্যতিক্রম হয় নি। নীলিমা অত আগ্রহ ক'রে তাকে নেমতন্ন করে। তার জন্য কত-রকম খাবার করে খেতে বললে—সে খেলো না। তার স্বভাব-সুন্দর সাবলীল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করে খেলো ঐ হবিষ্যি!

তারপর শিবনাথের অসুখের সময় তাকে একদিন দেখতে গেল রাজেনের সাথে। দু'দিন তার খাওয়া হয়নি। রাজেন তার জন্য আনলো ফল ও খাবার। সে তা খেলে না। সে বললে—আমি গরীব....গরীবের খাবার খাই।—খেলেও তা। এটা তার অবচেতন মনের কোন্ দিক? তার মৃত প্রথম স্বামীর স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠা হতেই পারে না।

তবে কি? তার এ আত্ম-পীড়ন কেন? নিজেকে না খেতে দিয়ে সে কেন এত পীড়া দেয়? অথচ বাহির থেকে দেখলে দেখা যায়, তার ভোগ-বিলাসের ইচ্ছা যে না আছে তা নয়। তার মোটর-গাড়ি চাই—সে অন্যকে দশখানা ভাল ভাল খাবার রেঁধে খাওয়াতে ভালবাসে—সে থাকে অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে। কমলের এই দুই বিভিন্ন ভাবধারার সামঞ্জস্য করতে আমি পারি নি। কমলের চরিত্রের এই দিকটা কি—ধরবার জন্যে আমি ফ্রয়েডের শরণাপন্নও হয়েছিলাম। আমি সেখানেও জবাব খুঁজে পাই নি।

দাদাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, বর্ত্তমান ভাবধারাকে

কমলের মধ্যে আপনি রূপান্তরিত ক'রে, তাকে মালসা খাইয়ে যে বাস্তব নারীর রূপ দিলেন—এর মূলে কোন বাস্তব জীবনকে কি আপনি রূপ দিয়েছেন ?

দাদা আমার প্রশ্নের উত্তর ঘুরিয়ে বললেন—আমার সব চরিত্রই আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে।—বলে আমার মুখ বন্ধ করে দিলেন।

তাই কমল কেবল তত্ত্ব বা যুগের ভাবধারার সমষ্টি নয়, সে অসম্ভব ভাবে বাস্তব, রক্ত-মাংসে গড়া নারী। শিল্পীর অপূর্ব্ব সৃষ্টি সে।

কমলের প্রশ্নের সমাধান এখনও হয়নি। যুগে যুগে নরনারীর জীবনে এটা শাশ্বত প্রশ্নই থেকে যাবে।

অচলা ও মৃণাল

গৃহদাহে অচলার চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা প্রচলিত আছে। কেউ কেউ বলেন, সম্প্রদায়-বিশেষকে শ্লেষ-বিদ্রূপ করেই তিনি অচলার চরিত্র এঁকেছেন। একথা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম। তিনি বললেন, সে কথা সত্য নয়। অচলা নারী-চরিত্রের একটা অবচেতন দিক। অচলা সুন্দরী নয়—সে শিক্ষিতা। দরিদ্র স্কুল মাষ্টার মহিমকে সে বিয়ে করে আদর্শের খাতিরে। বিয়ে করার পর তার কল্পনা সব উবে গেল বাস্তব জীবনের আঘাতে। সে যখন ঘরকন্না করতে এলো—আম বাগান, বাঁশ বাগান ঘেরা মেটে বাড়ী, পুকুর থেকে জল তুলতে হয়, একেবারে

সত্যিকার পাড়াগাঁ। সে পারলে না। তার ঘরকন্না সাজিয়ে দিয়ে গেল মৃণাল এসে। মৃণাল মহিমকে ভালবাসতো, কী সম্বন্ধের সুবাদে মহিম তাকে বিয়ে করল না। মৃণালের বিয়ে হলো আশী বছরের কাছাকাছি এক বৃদ্ধের সাথে। মৃণাল হাসি মুখেই সেটা মেনে নিল। সেই মৃণাল এসে যখন তার ঘরকন্না গুছিয়ে দিয়ে গেল—পরাজয়ের গ্লানিতে অচলার দেহ-মন ভরে গেল। সে দেখলো, তার কাল্পনিক প্রেমের সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। এই রকম দ্বন্দ্ব যখন তার মনের মধ্যে চলছিল, তার সেই মেটে বাড়িও একদিন পুড়ে গেল। বাড়ি পুড়বার সময় সুরেশ ছিল অবিশ্যি। এই সুযোগে—সুরেশ নিয়ে এলো অচলাকে কলিকাতায়। তার বাপের বাড়ি সেখানে। ছোট দোতলা বাড়ি একখানা—সেই কলতলা যেখানে তরকারির খোসা, মাছের আঁশ পড়ে থাকে, ভাতের ফ্যান গড়িয়ে পড়ে। সকাল-সন্ধ্যায় উনুনে আগুন দেবার সময় যেখানে সমস্ত বাড়ি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়। পাড়াগাঁয়ের মুক্ত আকাশ-বাতাস তার মনের কোণে কোনো ঠাঁই পেলো না—অচলা এই বদ্ধ পরিবেশে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। সুরেশ অচলার জন্যে বাড়ি ভাড়া করলো, বিলাসের উপকরণে তাকে সাজিয়ে—অচলাকে সেখানে তুললো। মহিম অসুখে পড়লো। সুরেশ নিজে ডাক্তার, সে মহিমের চিকিৎসার ভার নিল ও প্রাণপাত পরিশ্রমে মহিমকে ভাল করে তুললো। সহজ কৃতজ্ঞতার ভেতর দিয়ে অচলার মন সুরেশের দিকে আকৃষ্ট হলো।

এইবার চেঞ্জের পালা—বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে হবে অন্যত্র ; সুরেশ আর পারছে না—তার রক্তে আগুন জ্বলে গিয়েছে। তার সুপ্ত দানব-প্রকৃতি জাগ্রত হয়ে তার দেহ-মনে মাতামাতি সুরু করে দিয়েছে—সে আর নিজেকে সামলাতে পারলো না। মাঝপথে গাড়ি বদলানোর নাম করে, অচলাকে নিয়ে এলো ডিহিরীতে। অসুস্থ মহিম কোথায় পড়ে রইল। আগে হতেই সুরেশ অচলার জন্য সাজানো বাগান-বাড়ি ভাড়া করে রেখেছিল—দাস-দাসী সব দিয়ে সাজিয়ে। এলো তার জন্য গাড়ি। ঐশ্বর্য্য দিয়ে অচলাকে বাঁধবার ত্রুটি সুরেশ কিছু রাখলো না। এই পরিবেশে নারীর পক্ষে যা' স্বাভাবিক—অচলা বিদ্রোহ করল, পৃথক থাকল, পরে ধরা দিল। কিন্তু তার অন্তরের গ্লানি তার সমস্ত দেহ-মন ছাপিয়ে উঠলো। এখানে অচলা সুরেশকে বরণ করেনি—সুরেশের দানব প্রকৃতির কাছে তার দুর্ব্বল নারী-প্রকৃতি আত্ম-সমর্পণ করল। শিল্পী অচলার এই দিকটাই দেখিয়েছেন। এটা নারীর বাহিরের দিক। অচলা যে পরিবেশে গড়ে উঠেছে, সেখানে প্রেম-প্রীতির চাইতে ঐশ্বর্য্যই কাম্য—অচলার এটা স্বাভাবিক পরিণতি। শিল্পী কিন্তু তার নারী-প্রকৃতির অবচেতন দিক দেখিয়েছেন। অচলার আত্ম-সমর্পণের পরের দিন—বাংলোর বারান্দায় বসে অচলা অঝোরে কাঁদছে····তার উপমা দিয়েছেন শিল্পী—যেন পাথরে কোঁদা কালো মূর্ত্তি থেকে ঝরণার জল ঝরে পড়ছে। নারীর অন্তরের গ্লানিকে তিনি এক কথায় এইভাবে রূপ দিয়েছেন।

তার পরের ঘটনাও শিল্পী দেখিয়েছেন। মহিমের সাথে অচলার হঠাৎ দেখা হয়ে গেল এই ডিহিরীতেই—অচলা সামলাতে পারল না, মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। সুরেশ অচলাকে ফেলে ছুটলো প্লেগের রোগী দেখতে। সে নিজেকে দিন-রাত কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে চায়—নিজেকে সে অবসর দিল না। এক প্লেগের রোগীকে অস্ত্র করতে গিয়ে তার হাত কেটে প্লেগ হলো। খবর পেয়ে শেষ সময়ে দেখতে এলো অচলা ও মহিম। তাকে মহিম বললে—এইবার তুমি ভগবানের নাম করো। সে মুখ ফিরিয়ে নিলো।

জীবনের প্রশ্ন এর মধ্যে কতটুকু আছে? সেই সনাতন প্রশ্ন—প্রেম কি? subjective, না objective reality? প্রেম-ভালবাসা কি মনের অবস্থার বিশেষ কোন রূপান্তর? না, তার সাথে যাকে ভালবাসা যায়, তাকে পাওয়াই চাই? তাকে না পেলে, সে-ভালবাসার কোন মানেই হয় না—এইটেই হলো বর্ত্তমান যুগের ভাবধারা। প্রেম subjective reality বা নিছক মনের বিলাস বলে বর্ত্তমান মানব-সভ্যতা স্বীকার করে না। যাকে ভালবাসি, তাকে চাই।

মানবের আদিম মনোবৃত্তির তাড়নায় সুরেশ অচলাকে পেলো। তার পাবার চেষ্টা অভিনব নয়—যা হয়ে থাকে, criminal… মানব সমাজ ও সভ্যতার বিরোধী উপায়ে। তবু সুরেশ অচলাকে পেলো। মহিম সেজন্য অবিশ্যি আদালতে গেল না, কিন্তু জীবনের প্রশ্ন—সুরেশ কি অচলাকে সত্যই পেলো? মধ্য-যুগের

পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দের যুক্তি-তর্ক এর মধ্যে আসতে পারে না—কারণ ওগুলো এখন মিথ্যে। মানব-মনের বিচিত্র অনুভূতি ও তার পূর্ণতা দিয়েই একে বিচার করতে হবে। অচলাকে পেয়ে সুরেশের মনের পূর্ণতা বা fulfilment হয়েছিল কি ?

না, হয় নি।

তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বেড়েই চলেছিল। সে দেখেছিল, অচলার দেহ সে পেয়েছে ঐশ্বর্য্যের মধ্যে তাকে ডুবিয়ে রেখে, কিন্তু অচলার মন ছুটেছে মহিমের দিকে—তার রুগ্ন স্বামীর কি হলো, জানবার জন্য।

সুরেশ ভাবলো, বড় রকম আত্মত্যাগ করেও কি সে অচলার মন পাবে না ? তাই সে প্লেগের রোগীর সেবা করতে নিজেই প্রাণ দিল। কিন্তু অচলার মনে তার এই আত্মত্যাগ কোন গভীর রেখাপাত করলো না।

শিল্পী তাই দেখিয়েছেন—প্রেমে objective reality বা যাকে ভালবাসা যায় তাকে পাওয়াই বড় কথা নয় বা সেটা চরম সত্য নয়।

তবে অচলাকে পেলো কে ?

মহিম পেলো অচলার জন্য নানা দুঃখ ও ত্যাগের বিচিত্র অনুভূতির মধ্য দিয়ে। এইটেই শিল্পী subjective reality বলতে চেয়েছেন। এটাকে ভালবাসা বা প্রেম-ধর্ম্মের নিছক মনের বিলাস বলা চলে না। শিল্পী কি জীবনের এই শাশ্বত প্রশ্নের সমাধান করতে পেরেছেন ?

এইবার মৃণালের কথা বলি। মৃণালও একটি type বা আদর্শ—একেবারে নিছক কল্পনা নয়, বাস্তবের রূপ।

মৃণাল গ্রামের মেয়ে—আশ্চর্য্য সুন্দরী। বিয়ে হয়েছে তার এক বৃদ্ধের সাথে। মহিমকে সে ভালবাসতো। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের ভাবধারা তার মধ্যে কাজ করেনি। সে অতীতকে নিয়েই আঁকড়ে আছে। সমাজে সে-ও বেঁচে আছে—অচলাও বেঁচে আছে। দুজনেরই চলার পথে বাধা আছে। অচলার গতিবেগ তীব্র—সে যাকে বলে dynamic, মৃণাল কিন্তু static স্থিতিশীল!

অচলা ছুটেছে উল্কাগতিতে—নিজেই জানে না কোথায়? যখন তার গতিবেগ কমে এলো, সে দেখলো সে এসে পড়েছে এমন এক জায়গায়, যেখানে নিজের দিকে চেয়ে সে নিজেকেই চিনতে পারছে না।

আর মৃণাল? তার গতি মন্থর। তাকে যুগে যুগে দেখা যায় —সে সন্ধ্যাবেলা তুলসী-মঞ্চে প্রদীপ জ্বেলে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করছে....সে নিজের জন্য কিছু চায় না....আম-বাগান, বাঁশ-বনে ঘেরা মেটে-বাড়িই তার কাছে যথেষ্ট। সে অবসর সময়ে হয়তো সূতো কাটে....নয়তো পাড়া-পড়শীর বাড়ি গিয়ে তাদের আপদে-বিপদে নিজের শরীর দিয়ে যা পারে সেবা-শুশ্রূষা করে। মৃণাল যুগ-যুগান্ত কাল ধরে একই ভাবে চলেছে—বদলায় নি। তার জীবনে ছন্দ আছে, গতিও আছে—তবে মৃদু। তার জীবনের ছন্দ ও গতির মধ্যে সামঞ্জস্য আছে। জীবনের গতির সঙ্গে যদি

ছন্দের সামঞ্জস্য না থাকে, তবে সে গতিবেগ উল্কার মত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়।

অচলা ও মৃণালের চরিত্রে শিল্পী কি সেই দিকটাই দেখান নি ?

এই দুই নারীর জীবনে জীবনের প্রশ্ন—প্রেম কি চায় ? সোজা কথায়—মন, না দেহ ? তারই সমাধানের চেষ্টা করেছেন শিল্পী।

জীবনের এ-প্রশ্ন শাশ্বত—এই আশ্চর্য্য জীবনবাদী দুই নারীর জীবনের মধ্যে দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন।

কিরণময়ী

চরিত্রহীনের কিরণময়ী হচ্ছে নারীর অবচেতন মনের অন্য একটা দিক। কিরণময়ী চরিত্রে শিল্পী একটি শাশ্বত প্রশ্ন সমাধানের চেষ্টা করেছেন—সেটা হচ্ছে নারীর বর্ত্তমান সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'কিরণময়ী' শিল্পীর অন্য সব নারী-চরিত্রের চেয়েও বড় সৃষ্টি।

কিরণময়ী সুন্দরী, যুবতী, শিক্ষিতা—এক কথায় নারী-জীবনে তার নিজের দিক থেকে যা কিছু কাম্য, তার সবই আছে। ঘটনার সংঘাতে সে পড়লো গিয়ে এক চির-রুগ্ন স্বামীর হাতে। তার জীবনের চাহিদা ছিল, কিন্তু তার এই রূপ, যৌবন ও শিক্ষার সমাবেশে সে কি পেয়েছিল ? আরো কী না সে পেতে পারতো ? তার এই বঞ্চিত জীবনই সেই শাশ্বত প্রশ্ন ? সে তার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে, তার জীবন দিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে।

কেবল চাওয়া ও পাওয়ার সংঘাতে এ-প্রশ্নের কোন সমাধান হয় না। শিল্পী কেবল সংঘাতের মধ্য দিয়ে তার বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গীকে রূপ দিয়েছেন। শিল্পীর কাজই তাই।

কিরণময়ীর জীবন একটানা চলছিল রুগ্ন স্বামীকে নিয়ে। সুযোগ বুঝে এক ডাক্তার এলো। ডাক্তার দরকার—তার চির-রুগ্ন স্বামীর চিকিৎসার জন্যে। ডাক্তার অবিশ্যি ফি নিতো না—তারা দিতে পারতো না। ডাক্তার দেখলো কিরণময়ীকে। রোগী দেখে ফেরবার মুখে রান্নাঘরের দোরে দাঁড়িয়ে কিরণময়ী তার সাথে গল্প করতো। কিরণময়ী বুদ্ধিমতী—সে দেখলে, এ সুবিধেই বা ছাড়ে কেন? একে নিয়ে একটু খেলানো যাক্! তার সহজ পরিহাস-প্রিয়তায় সে খেলিয়েই চললো! যাকে ইংরেজীতে বলে, for want of better occupation বাইরের কারো সাথে কথা বলবার মত তার কেউ ছিলও না। ডাক্তার ছিল সেই চরিত্রের লোক, যারা কোনদিন মেয়েদের সাথে মেশবার সুযোগ পায়নি। যারা ষ্টেথসকোপ লাগিয়ে নারী-দেহের হৃৎপিণ্ডে রক্ত-চলাচলের শব্দই শুনেছে, নারী-মনের কোন খবর রাখেনি বা পায়নি। তার কাছে ষ্টেথসকোপই সব—সেই মাপকাঠি দিয়েই সে দুনিয়া যাচাই করে। প্রেম, ভালবাসা, আত্মত্যাগ—এসবের কোন আদর্শ তো দূরের কথা, কোন ধারণাই তার ছিল না। সে মানব-দেহ ডিসেকসন করে, কেটেকুটে যা পেয়েছে তাই তার সম্বল—তার বেশী সে জানে না। কিরণময়ীর মোহে সে পড়ে গেল। তাকে সে এক-সুট গহনা গড়িয়ে

দিলো। কিরণও হাত পেতে নিলো এই ভেবে যে, যা আসে মন্দ কি? দেখা যাক, এর দৌড় কতদূর? ডাক্তার ষ্টেথসকোপ দিয়েই বিচার করলো—যা সে দিল তার বদলে কী পাওয়া যায়? কিন্তু পেলো না সে কিছু। সে বুঝলো, তার ষ্টেথসকোপের কল বিগড়েছে—হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সে ঠিক ধরতে পারে নি।

এমন সময় এলো উপেন—কিরণময়ীর স্বামীর ডাকে। তখন তার শেষ অবস্থা। সে মারা গেলে কিরণের কি হবে? সম্বল তো মাত্র ভাঙ্গা বাড়িখানা! ছেলেবেলার বন্ধু উপেন, তারই হাতে কিরণময়ীকে সঁপে দিতে চায় সে। উপেনকে কিরণময়ী দেখলো। সুপুরুষ, চরিত্রবান ও অর্থশালী—এক নিমেষে তার অবচেতন মন সাড়া দিল। যেন তার দেহ ও মন একসাথে বলে উঠলো—এইতো, আমি যা চেয়েছিলাম, এই সে!

তারপর চললো তার সাধনা উপেনকে পাবার জন্য। এলো দিবাকর তাদের বাড়িতে পড়তে। দিবাকর বালক—নারীর দেহ ও মনের কোন ধার সে ধারে না। দিবাকর উপেন-গত প্রাণ। 'ঠাকুরপো' ব'লে উপেনের কথা জানবার জন্যে কিরণময়ী দিবাকরকে আঁকড়ে ধরলো এবং যখন সে জানলো, উপেন তার স্ত্রীকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তখন উপেনকে পাবার ইচ্ছা তার শতগুণ বেড়ে গেল। তার নারী-জীবনের ব্যর্থতা নানাভাবে ও নানাছন্দে উপেনের চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। সে ভাবলো, আমার জীবনও তো এইভাবে সার্থক হতে পারতো। তার এই মনের

সংঘাত শিল্পী দেখিয়েছেন উপেনের স্ত্রী সুরবালা আর কিরণ-ময়ীর রূপ বর্ণনায়।

দিবাকরকে আশ্রয় করে কিরণময়ী উপেনকে পেতে চায়। কিরণের হাসি-ঠাট্টায় ও সময়ে-অসময়ে নর-নারীর যৌন-ইঙ্গিতের শ্লেষ-বিদ্রূপে দিবাকর নিজেকে বিব্রতই মনে করতো। এই ভাবে দিবাকর বেড়ে চললো। কিন্তু কিরণময়ী দিবাকরকে কোন দিন ভালবাসে নি। তারপর কিরণময়ী দিবাকরকে নিয়ে রেঙ্গুনে পালায়। এই ঘটনা আকস্মিক! কিন্তু এ ছাড়া কিরণময়ীর পথ ছিল না—তাকে একটা কিছু করতেই হবে! যখন কিরণ দেখলো, উপেনকে সে পেলো না, তখন তার প্রত্যাখ্যানের ও ব্যর্থতার গ্লানিতে মন ভরে গেল। সে উপেনকে দেখাতে চাইল—উপেন দেখুক, কিরণময়ী কত ঘৃণ্য! উপেনকে আঘাত দেবার জন্যই সে নিজের উপর চরম আঘাত হানলো—যে আঘাত সে দিতে চেয়েছিল সমাজের উপর।

এটা যে নারীর অবচেতন মনের কত বড় দিক, তা বলা যায় না। নারী পারে না এমন কিছু নেই। সে সব পারে। নিজেকে নিঃশেষ ক'রে লুপ্ত ক'রে ফেলতে পারে পর্য্যন্ত—যাকে সে চায় তার জন্যে। সেটা তাকে পেয়েও পারে—না পেয়েও পারে।

কিরণময়ী আগাগোড়া নারী-জীবনের ব্যর্থতা বা frust-ration-এর জীবন্ত চরিত্র—তার সঙ্গে আছে তার প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। তারপর রেঙ্গুনের পথে দিবাকরের সঙ্গে ষ্টিমারের কেবিনের ঘটনা। কিরণময়ী

দিবাকরকে বুকে ধরে চাপছে আর, বলছে কেমন, তোমার উপেনদা দেখলে কী বলতেন ?

এই সময় কিরণময়ী বুঝলো যে সুপ্ত আদিম মানব-প্রবৃত্তি দিবাকরের মধ্যে জেগেছে। সে আর বালক নয়। দিবাকরের এখন কিরণময়ীকে পাবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ। কিরণময়ী নিজের ভুল বুঝতে পেরে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করলো। রেঙ্গুনে পৌঁছে নানা ছলে সে দিবাকরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে।

তার পরের ঘটনা—তাকে সতীশ নিয়ে এলো, কিন্তু তখন উপেনের স্ত্রী—ডাক নাম পশু—মারা গেছে। উপেন এখন সাবিত্রীর হাতে। কিরণময়ী আর সইতে পারলো না, তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। কিরণময়ী নারীর ব্যর্থ-জীবনের বাস্তব চিত্র—তার জীবনের fulfilment বা পূর্ণতা সে পেল না। সে নিজের সারাটা জীবন দিয়ে গেল বিদ্রোহ ক'রে প্রতিবাদ জানিয়েই—শেষ পর্য্যন্ত আত্মহত্যা করে নয়, ব্যর্থতার উন্মাদনায়।

মূল এই কথার মধ্যে শিল্পী এনেছেন সতীশ ও সাবিত্রীকে। তাদের কথা না বললে শিল্পীর সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিপ্লবী-দৃষ্টিভঙ্গীর বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তারাও সজীব ও জীবন্ত। চরিত্রহীন শিল্পী নিজে—সতীশ তার রূপান্তর। ভাগলপুরের জীবনের চরিত্রের একটা দিক তিনি নিজে এঁকেছেন। সেই সরল, অমায়িক, গানবাজনা-প্রিয়, পরের দুঃখে কাতর। তফাৎ—এখানে সতীশ ধনীর ছেলে, আর সাবিত্রী মেসের ঝি। সে এলো যে-ভাবে এরা চিরদিন এসেছে

নিজের ঘর ছেড়ে—পথের ডাকে, অনিশ্চিতের মোহে। সতীশকে সে ভালবাসলো, সতীশও তাকে ভালবাসলো। বিয়ে কিন্তু তাদের হলো না। সাবিত্রী বললে—সে দেহ-মনে অশুচি। এই সাবিত্রীকে এনে শিল্পী সমাজ-জীবনে যে কি এক অভিনব বিপ্লবের সৃষ্টি করেছেন, তা বলা যায় না। এই প্রশ্ন শিল্পী করে গেছেন—আমাদের সমাজে সাবিত্রীর যে সনাতন আদর্শ আছে, তার কাছে এ দাঁড়াতে পারে কি না? কেবল নামের জোরে নয়, চরিত্রের জোরেও!

এই চরিত্রহীন বই বেরুবার পর দাদাকে কম লাঞ্ছনা পেতে হয় নি। শেষ প্রশ্নের অক্ষয়ের দল, অর্থাৎ যাঁরা সনাতন পন্থী, তাঁরা ইতর জঘন্য ভাষায় বইয়ের সমালোচনা করেন। শিল্পীর জীবন নিয়ে—যেটা তাঁরা কখনও জানেন নি—অভদ্র ইঙ্গিত করেন; এক কথায় যার সারমর্ম্ম এই হয়—'গুয়ের পোকা ময়লা ও নোংরা ছাড়া আর কী দেখবে?'

এইখানেই শেষ হলো না। দাদা একদিন বাজে শিবপুরের বাড়িতে বসে আছেন তাঁর সনাতন ইজি-চেয়ারে—তিন চারিটি যুবক চরিত্রহীন বই হাতে করে নিয়ে এসে নানা ইতর কথা বলে তাঁকে শাসিয়ে বললে—এ রকম বই লিখলে এ-পাড়ায় আর তাঁর থাকা চলবে না। এটা ভদ্রপাড়া—লোকে বৌ-ঝি নিয়ে ঘর করে। পরে তারা কেরোসিন ঢেলে তাঁর সামনেই বইখানা পুড়িয়ে চলে গেলো। দাদা কোন কথা বললেন না। তাঁর চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়তে লাগল—তাঁর চোখ দিয়ে জলও

পড়ল না। এই তীব্র দৃষ্টি ও আগুনের দাহে তিনি সমাজ-দেহের অতীতকে, জড়তাকে জ্বালিয়ে দিয়ে, চরিত্রহীনের পোড়া ছাই কুড়িয়ে নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন।

রূপকথার সাবিত্রী রাজকন্যা, সুন্দরী। রাজার ছেলের সাথে তার বিয়ে হয়। ঘটনা-সংঘাতে যাকে আমরা এতদিন বলে এসেছি—ভাগ্যদোষে তার রাজ্য যায়। তারা বনে যায়, কাঠ কেটে খায়। সে-যুগের শিল্পীরও টেকনিকে কোন ত্রুটি নেই, নিখুঁত টেকনিক—সহজ ঘটনার সমাবেশ। সাবিত্রী তার বরকে ভালবাসে—তার বরের কাঠ কাটার সাথীও সে। দু'জনের কেউ কাউকে ছেড়ে থাকে না। রোজই এমনি হয়, রোজই তারা বনে যায় কাঠ কাটতে। জ্যৈষ্ঠ মাস—ঝড়-বাদলার দিন, চতুর্দ্দশীর রাত। ঝড় উঠে এলো চারদিক আঁধার করে। তাড়াতাড়ি নামতে স্বামী গাছ থেকে পড়ে মূর্চ্ছা গেল—দেখে মনে হয়, মরে গেছে। বালিকা সাবিত্রী কী আর করে! তার বুকফাটা কান্না বনের চারদিক হা-হা ক'রে ঝড়ের বাতাসের সাথে শনশনিয়ে যেতে লাগলো। ধরণীর বুকে আঁধার নেমে এলো। ছোট মেয়ে, কিন্তু ভয় পেলো না সে। স্বামীর মূর্চ্ছিত দেহটি কোলে ক'রে, সে তার কচি বুক দিয়ে তাকে রক্ষা করতে লাগল। ঝড়, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র সারারাত সমানে চলেছে। বিদ্যুতের ফাঁকে ফাঁকে বনের আলোছায়ায় নানা বীভৎস ছবি সে দেখতে লাগলো—যেন তারা প্রেত। ক্ষণিক বিদ্যুতের আলোতে মনে হতে লাগলো তার, কী লিকলিকে জিব তাদের! কী তাদের লোলুপতা! আবার কখনও সে দেখলো বনের

গাছেরই মত দীর্ঘকায় তারা যেন—স্পর্দ্ধা তাদের আকাশস্পর্শী। তারা স্বামীর মৃতদেহ ছিনিয়ে নিতে চায়, কিন্তু সে দেবে কেন? আরো জোরে সে চেপে ধরলো তার স্বামীর মূর্চ্ছিত দেহটিকে তার বুকের মধ্যে। তার মনে হলো, তার বুকের উত্তপ্ত শোণিতের স্পর্শে এ-মূর্চ্ছিত দেহে আবার প্রাণ আসবে। পালিয়ে গেল সেই সব ছায়া-মূর্ত্তি। তখনও ঝড়-বৃষ্টির বিরাম নেই। সে ভাবছে তার নিজের কথা—কী না ছিল তার? রাজ্য, ঐশ্বর্য্য! এখন কি নিয়ে সে বাঁচবে? কত দিন তার সামনে পড়ে আছে? তার নিজের এত দুঃখের মধ্যেও মনে পড়লো তার অন্ধ শ্বশুরের কথা। নিজের কথাও সে ভুলে গেল। সে ঠিক করলে স্বামীকে বাঁচাতে হবে—অন্ততঃ তাঁদের জন্যে। তখন দেখতে পেলো—যাকে শিল্পী কল্পনায় যম বলেছেন, তার সেই অবচেতন মনের দিক সে বাড়ি, ঐশ্বর্য্য সব চায়। তার নিজের এই সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা কালো যমের রূপ নিয়ে তার মন ভোলাতে লাগলো। সে বললে-- তোমাকে সব দিচ্ছি, কেবল তোমার স্বামীকে নিয়ে যাব। সাবিত্রী বললে—সেটি হবে না। আমি কিছুই চাই না, কেবল ওকেই চাই।

দুনিয়ার সাথে তার চাওয়া ও পাওয়ার হিসেব মেটাবার সাথে সাথে যখন সে বুঝলো আর-সব চাওয়া মিথ্যে—সত্যবান ছাড়া তার চলতেই পারে না—দুনিয়ার ঐশ্বর্য্য একদিকে, আর সত্যবান একদিকে। তার মনের এই দৃঢ়তা দেখে তার কল্পনার প্রলোভনের যম পালিয়ে গেল। সে দেখলো ভোর হয়েছে,

চারিদিকে পাখী ডাকছে, ঝড়-বৃষ্টি থেমে গেছে—নতুন রোদ, নতুন আলো এসে পড়েছে সত্যবানের মুখে। সত্যবান উঠে বসলো—ঠিক ঘুম থেকে জাগা মানুষের মতই। সে উঠে বললে—আমি এতক্ষণ ঘুমিয়েছি, তুমি ডাকনি সাবিত্রী!

সাবিত্রী তার হাত ধরে হেসে বললে—বাড়ি চলো।

আর শিল্পী যে সাবিত্রীকে সমাজের সামনে, এই সাবিত্রীর পাশে দাঁড় করিয়েছেন—সে?

ঘর থেকে বেরিয়ে আসা এক মেয়ে—ঠিক যেন বনে কাঠ কাটতে যাওয়ার মত বাসা বাঁধলো কলকাতা শহরের ইট-কাঠের বনে। তার জীবনের কী দুর্য্যোগ রাত! তার রূপ ছিল। চারিদিক থেকে মানুষ-প্রেতের দল তাদের লিকলিকে জিব বের করে কা প্রলোভনই না তাকে দেখাতে লাগল! এই সময় তার জীবনের দুর্য্যোগের কাল রাত কেটে গেল সতীশকে ভালবেসে। সে পেলো নতুন আলো। সে নিজের জন্য কিছু চাইলো না, কেবল বললে—আমি দেহ-মনে অশুচি····তবে আমি তোমার।

তার অকুণ্ঠ প্রেমে সতীশের রূপান্তর হলো। সে ছেড়ে দিল মদ, ভাঙ, গাঁজা। সেও পরের জন্যই নিজেকে ছেড়ে দিল। সাবিত্রী অন্তরে শুচি—ব্যাভিচারিণী নয় সে। যুগধর্ম্মের আবর্ত্তনে রূপকথার সাবিত্রী মেসের ঝি সাবিত্রীতে রূপান্তরিত হয়েছে। এই তাঁর প্রশ্ন, তাঁর বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী এইখানেই।

এই সাবিত্রীকে নিয়ে তখনকার দিনে আমাদের কী না মাতামাতিই চলতো। দাদাকে গিয়ে বলতাম—দাদা, সাবিত্রীকে

কোথায় পেলেন ?—দাদা হাসতেন। কিন্তু মনের কথা আর কতক্ষণ চাপা থাকে, তখন বলতেই হলো—যদি জানেন, কোথায় সে আছে বলুন—তাকে চাই। দাদা বলতেন—খুঁজে দেখো। খুঁজতুম আমরা সত্যিই—স্থানে-অস্থানে, কিন্তু সাবিত্রীর আর দেখা পাওয়া যেতো না। শেষে হতাশ হয়ে গিয়ে বলতাম—না দাদা, পেলুম না। দাদা হেসে বলতেন—খোঁজ, পাবে! এতদিনে মনে হয়, বোধহয় পেয়েছি। যেন পেয়েছি তাকে, দেখতে পাচ্ছি যুগধর্ম্মের আবর্ত্তনে সাবিত্রীর নতুন রূপান্তর। এখন মনে হয়, এইটেই সত্যিকার পাওয়া।

ভাগলপুর, রেঙ্গুন সব মিলিয়ে এই চরিত্রহীন—যেটা নিজেকে তিনি দেখিয়েছেন। রেঙ্গুনে বা ভাগলপুরে তিনি সাবিত্রী ও কিরণময়ীকে দেখেছিলেন কিনা বলেন নি—হয়তো দেখেছিলেন। এই দুই চরিত্রের মধ্যে দিয়ে তিনি যে সব প্রশ্ন করেছেন সেগুলির আভাস তিনি তাঁর নিজের বাস্তব জীবনেই পেয়েছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর কোন নিকট-আত্মীয়কে তিনি উপেনের ভূমিকায় নামিয়েছেন—একেবারে আদর্শবাদের প্রতীক করে। সেই আত্মীয়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এতখানিই ছিল।

শ্রীকান্ত

চার পর্ব্বে বা চার ভাগে বড় উপন্যাস। এখানিকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না—এখানি একজন ভবঘুরের, ইংরাজীতে যাকে বলে vagabond-এর জীবন-কাহিনী। এই vagabond বা ভবঘুরের "ছি-ছি জীবনের কথা" এর আগে

বাংলা-সাহিত্যে আর কেউ দেখেনি। এটা শিল্পীর জীবনীও বটে —সে কথা পরে বলবো। সুটকেশ সাজিয়ে, টিফিন-ক্যারিয়রে খাবার নিয়ে ও হোল্ডলে বিছানা বেঁধে বড় জোর টুরিস্ট হওয়া যায়, কিন্তু ভবঘুরে হওয়া যায় না।

এই ভবঘুরের জীবনীতে আছে সত্যিকার জীবন-বোধের বিস্ময়। ভবঘুরে কোন ধরা-বাঁধা পথে চলে নি। চলতে চলতে যারা তার গতি-পথে এসেছে, শিল্পী তাদের নিখুঁত ছাপ রেখে গেছেন, তার সাথে নিজের জীবনের ও অনুভূতির।

প্রথম ভাগ—তাঁর ভাগলপুরের বাল্য-জীবন। সব চাইতে তাঁর জীবনে যে বিস্ময় ফুটে উঠেছিল, সে ইন্দ্রনাথ ও অন্নাদাদিদি।

এই ইন্দ্রনাথ * কে? তার পিছনে যে সত্যিকার মানুষটি ছিল সে আজ নেই, শিল্পী তাকে হারিয়েছিলেন। সে কোথায় চলে গেল, কেউ তাকে আর দেখে নি। তাঁর প্রথম জীবনে এত বড় ব্যথা বোধ হয় তিনি আর পান নি। কিন্তু ইন্দ্রনাথ রেখে গেল তাঁর বন্ধুত্বের মধ্যে তার ভবঘুরে ও উদাসী মন, আর দিয়ে গেল শিল্পীকে অন্নদাদিদির পরশ। শিল্পী সারা জীবন ও দুটো ভোলেন নি। ইন্দ্রনাথ ও অন্নদাদিদির স্মৃতির কাছে তাঁর অত সাধের রাজলক্ষ্মীও যেন ম্লান হয়ে যায়।

মজুমদার—ভাগলপুরের বিখ্যাত সুরশিল্পী সুরেন্দ্র মজুমদারের ভাই। সুরেনবাবু বোধ হয় মারা গেছেন। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, বোধ হয় রায় বাহাদুরও ছিলেন, সেটা তাঁর পরিচয় নয়।

মাছ চুরি ও মসজিদ বাড়ির দাদার কথায় আছে—কিশোর হৃদয়ের আশ্চর্য্য বিস্ময়। এই দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রনাথের মধ্যে তিনি পেয়েছিলেন—মানুষের অপরাজেয় মনের আভাস। আর পেয়েছিলেন এই সত্যের সন্ধান যে—মানুষের জীবনে পথই সত্য, জীবনে তার গতিই সত্য। স্থিতিটা তার কিছু নয়। এই পথের নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল—যেটা ভবঘুরের সত্যি রূপ। তাই বুঝি শেষ জীবনে তিনি 'পথের দাবী' লিখে পথে চলবার ঋণ কিছু শোধ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পথের দাবী কেউ মেটাতে পারে না। তাঁর অনুরক্ত সুহৃৎ নেতাজী তাঁর পথের দাবীকে বাস্তবে রূপ দিয়েছিলেন—তিনিও পথের দাবী মেটাতে পারেন নি, তিনিও পথ বেয়েই চলে গেছেন—থামেন নি কোথাও। এই ইন্দ্রনাথের সাহচর্য্যে তিনি দেখা পান অন্নদাদিদির। অন্নদাদিদি যে তাঁর হৃদয়ে কতখানি স্থান জুড়ে ছিলেন তা' বলা যায় না। তাঁর জীবনে যত নারী এসেছে, কাউকে তিনি অন্নদাদিদির চাইতে বড় স্থান দেন নি।

ইন্দ্রনাথ এই অন্নদাদিদিকে সাহায্য করবার জন্যই ঐ রকম ভীষণ বিপদসঙ্কুল অবস্থার মধ্যে মাছ চুরি করে টাকা দিতো—যদিও তার মনের কোণে লুকানো থাকতো অন্নদাদিদির স্বামী সাহাজীর কাছ থেকে সাপের ওষুধ ও মন্ত্র শেখা। শিল্পী তাঁর সাথে অন্নদাদিদির প্রথম সাক্ষাতের যে বর্ণনা দিচ্ছেন—তাতে মনে হয় তাঁর অবচেতন মনে ছিল—সেই সুদূর অতীতের এক

পর্ব্বত-রাজকন্যার কথা, যাঁর কথা কালিদাস আটটি স্বর্গ কুমার-সম্ভব লিখেও শেষ করতে পারেন নি।

অন্নদাদিদি এলেন—শিল্পী বলছেন, যেন সদ্য তপস্যা থেকে উঠে আসছেন—গৌরীর মতই তপঃক্লিষ্টা, কৃশা, অথচ জ্বলন্ত হোমশিখা, যার দিকে চাওয়া যায় না—আপন মহিমায় আপনি দৃপ্ত, অথচ অপার করুণা ও স্নেহধারা যাঁর শতছিন্ন গাঁট বাঁধা মলিন বসন হতে ঝরে পড়েছে। শিল্পী বলছেন, এরকম দেখা যায় না। সত্যিই দেখা যায় না।

এক বিরাট বট ও তেঁতুল গাছের ছায়া অন্ধকারে ঢাকা জীর্ণ পর্ণকুটিরে তিনি প্রবেশ করছেন সদ্যস্নাতা। ইন্দ্রনাথ বললে—দিদি তুমি ঘরে ঢুকো না—জংলী সাপ ঘরে ঢুকেছে!

দিদি হেসে বললেন—তাইতো ইন্দ্রনাথ, সাপুড়ের ঘরে সাপ ঢুকেছে—ভাববার কথাই বটে!—বলে ঘরে ঢুকে সাপটা ধরে প্যাঁটরায় পুরলেন। বিস্ময়ে ইন্দ্রনাথের তাক লেগে গেল।

এই পরিবেশে এই মহিমান্বিত নারীকে দেখে অনেক আগে-কার বাংলার মঙ্গল সাহিত্যে একজনের কথা মনে পড়ে: সে হচ্ছে কালকেতুর, এই রকম জীর্ণ পর্ণ কুটিরে দেবী ভগবতীর আবির্ভাব একদিন হয়েছিল। যার রূপ দেখে কালকেতু হকচকিয়ে গিয়েছিলো।

এই অন্নদাদিদি কে? বড়লোকের মেয়ে; তাঁর স্বামী তাঁর বিধবা ভগ্নীর অবৈধ প্রেমে প'ড়ে, তাকে খুন করে পালায়। বছর দশ পর ঠিক এই সাপুড়ে বেশেই বাড়ির ফটকে সাপ

খেলাচ্ছিলেন—তাকে অন্নদাদিদি চিনলেন। সাপুড়ে সাহাজী বললে —তুমি আমার সাথে চলে এসো, আমি তোমার জন্যই এসেছি।

দিদি তাঁর এই সাপুড়ে খুনীর সাথেই গৃহত্যাগ করলেন। লোকে জানলো না যে, তিনি স্বামীর সাথে চলে এসেছেন—লোকে জানলো অন্য কথা; যেটি নারীর চরম দুর্গতি—যে অন্নদা কুলত্যাগ করেছে এবং সারাজীবন এই মহিমময়ী নারী এই চরম কলঙ্ক বহন করেছেন এক খুনীর জন্য।

এটা নারীর অবচেতন মনের কোন্ দিক? স্বামীর প্রতি তার ভালবাসা থাকা সম্ভব নয়—যে তার বিধবা বোনের প্রতি অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত ও তার পরে তাকে খুনও করেছে। অন্নদা-দিদি নিজের মুখেই বলছেন, বাপের বাড়িতে স্বামী-নিন্দায় ও তার সেই অমানুষিক কাজের জন্য সেখানকার আবহাওয়া এমন বিষাক্ত হয়েছিল যে, সেখানে থাকা আমার পক্ষে কোন রকমেই সম্ভব ছিল না। পরে ও যখন আমাকে এসে ডাকলো আমি চলে এলুম, কিন্তু ও আমাকে ভালবাসেনি। ভালবাসা যে ছিল না একথাই বা বলি কি করে? সাহাজী সাপের কামড়ে মরে গিয়েছে—দিদি তার মৃতদেহটা কোলে করে বসে আছেন, সাহাজীর মৃত নীলাভ ঠোঁটে চুমো দিয়ে কাঁদছেন—পরে সাহাজীর কবরের উপর পড়ে তাঁর কী বুকফাটা কান্না!

শ্রীকান্ত বইখানাতেই আগাগোড়া নারীর স্বামীর প্রতি তাদের অফুরন্ত প্রেমের কথাই বলেছেন এবং এতে এই কথাই বোঝা যায়, শিল্পী এতদিন যে সব নারী-চরিত্র এঁকেছেন তারা

নারীর বিভিন্ন মনের অবস্থা—সেগুলো নারীর সত্যকার রূপ নয়। নারীর সত্যকার আসল রূপ হচ্ছে—নারীর একনিষ্ঠ প্রেম। একবার সে যাকে ভালবাসে, তাকে কখনও ভোলে না ও তার জন্য জীবনে সে সব রকম দুঃখ বরণই করতে পারে। এই বাস্তব সত্যের অন্তরালে তাঁর অবচেতন মনে ছিল—এই রকম এক সাপুড়ে স্বামীকে পাবার জন্য এক সুন্দরী কিশোরীর তপস্যা—যাকে আমরা বলি ত্যাগ ও দুঃখ বরণ। নারীর প্রতি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা তাঁর ছিল—তিনি নিজেই বলেছেন, মেয়েদের সম্বন্ধে নিন্দা বিশ্বাস না করে ঠকাও ভাল, তবুও তাদের চরিত্রে দোষারোপ বিশ্বাস করতে নেই। নারীর প্রতি এই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাবোধ হতেই তিনি দিয়ে গেছেন—অন্নদাদিদি, অভয়া ও রাজলক্ষ্মী। সব কটি চরিত্রই নারীর স্বামী-প্রেমের ও নারী স্বামীর জন্য ঘর ছেড়ে এসেছে, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেছে ও অশেষ দুঃখ বরণ করেছে। অথচ তাদের প্রত্যেকের স্বামীই মাতাল, খুনী বা অকর্ম্মণ্য ভবঘুরে—দুনিয়ায় যাদের এক কানা আধলাও দাম নেই।

এই তিন নারীর মুখ দিয়েই সে-প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। অন্নদাদিদি বলছেন—উনি সাহাজী যখন মোছলমান, তখন আমিও মোছলমান ভাই। এই কথায় ইন্দ্রনাথ খুব আঘাত পেলো—সে তার অন্নদাদিদিকে কখনও মোছলমান বা অন্য ধর্ম্মের, একথা ভাবতে পারে না। ভোরের বেলা নতুন ওঠা লাল টকটকে সূর্য্যের মত যাঁর কপালে সিন্দুরের ফোঁটা,

তাঁর অন্তরের বহ্নিশিখার মতই তার শুভ্র ললাটে সব সময় দপদপ করে জ্বলতো। সে কখনও অন্য ধর্ম্মের হতে পারে না! কিন্তু উপায় কী! সব কথাতো ইন্দ্রকে খুলে বলা যায় না—ইন্দ্র তাহলে রাগ করে, কেঁদে কেটে হয়তো সাহাজীকে মেরেও ফেলতে পারে, হয়তো বা মনের দুঃখে ইন্দ্র মরেও যেতে পারে। অন্নদাদিদির সব কথা সেইজন্য তাদের বলা হলো না, সাহাজী বেঁচে থাকতে। ইন্দ্রের তার দিদির প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর, তার পরিচয় পাই আমরা যেদিন সাহাজী জানতে পেল যে, দিদি তার ব্যবসার গুপ্তকথা ফাঁস করে দিয়েছেন—যে সাপ ধরার মন্ত্র ওষুধ সব ফাঁকি, কৌশলই সত্য। আর যায় কোথা? সাহাজী রেগে অন্নদাদিদিকে লাঠি দিয়ে মারল—দিদির মাথায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেল, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন—ও চৈতন্য হলো অনেক দেরীতে। সময়ের এই ব্যবধানটুকুর মধ্যে ইন্দ্র সাহাজীকে আক্রমণ করে তার বুকে বসে তাকে শেষ করে এনেছে, এমন সময় দিদির জ্ঞান হলে তিনি তাকে ছাড়িয়ে দিয়ে সাহাজীর প্রাণ বাঁচালেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কেন এমন হয়? সাপুড়ে, গেঁজেল, যার ভাত জোটে না, মাথা গোঁজবার যার জায়গা নেই, তার উপর রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যে তার স্ত্রীকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে—তার জন্য নারীর এত দরদ কেন? এবং এ-দরদ কোথা হতে আসে?

বলা অত্যন্ত কঠিন, এ-মনের বিশ্লেষণ করতে গেলে বলতে

হয়—নারীর আজন্ম সংস্কার। কিন্তু সংস্কার বলেই উড়িয়ে দেওয়া তো যায় না, এতে নারী-মনের ইচ্ছাকৃত সক্রিয় অংশই বেশী, এটা তার প্রেমের সত্যিকার রূপ! সংস্কার কেবল অন্ধ বিশ্বাস।

সেইজন্য এই ভবঘুরের জীবনে যে কটি নারী বা পুরুষ জুটেছিল তার অনিশ্চিত যাত্রা-পথে, তার সব কটিই ভবঘুরে ও অনির্দ্দিষ্ট পথের যাত্রী! একমাত্র এই কথা বলেই বোঝান যায় যে, কথা-শিল্পী নিজেই বলেছেন, আমাদের মন আমরা কত-টুকু বুঝি বা জানি যে অন্যের মন আমরা যাচাই করতে যাই?

শ্রীকান্তের জীবনের প্রথম পর্ব্ব শেষ হলো—অন্নদাদিদির অজানা পথে যাত্রা—মাত্র পাঁচ আনা পয়সা সম্বল করে। তাঁর শেষ সম্বল দুটি মাকড়ি বেচে, তাঁর স্বামী সাহাজীর তাড়ি, গাঁজা, মদ ও ভাঙের দেনা মিটিয়ে, শ্রীকান্তের দেওয়া পাঁচটি টাকা ফেরত দিয়ে, চিঠিতে তাদের আশীর্ব্বাদ করে তিনি চলে গেলেন—কোথায় কেউ জানে না।

এই ঘটনা ইন্দ্র ও শ্রীকান্তর মনে এত গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল—আর তাদের দু'জনের মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হতো না, শ্রীকান্তও অসাড় নির্জ্জীবের মতই পড়ে থাকতো, আর ভাবতো অন্নদাদিদির কথা। এই আঘাতে তাঁর অবচেতন মনে আবার জেগে উঠলো, তাঁর সনাতন ভবঘুরে বৃত্তি, যেটা এতদিন পুরী হতে ফেরবার পর আর মাথা নাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি।

তিনি চললেন এবার তাঁর বন্ধু কোন এক কুমার সাহেবের নাচ ও মদের আড্ডায় শিকারের নিমন্ত্রণে। ভবঘুরে জীবনের কৈশোরের

শেষে যৌবনের আগমন এই ভাবেই ফুটে উঠলো—ঠিক নতুন বসন্তের আগমনের মতই ! ফুল ফোটার দেরী আছে—কিন্তু ঝরা পাতার আবর্জ্জনায় তাঁর প্রথম জীবনের চারিদিক ছেয়ে আছে।

দ্বিতীয় ভাগে শ্রীকান্তকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কুমার সাহেবের আড্ডা বা তাঁবুতে—মোসাহেব-বেষ্টিত হয়ে অজস্র সুরার স্রোতে। তার মধ্যে আমরা প্রথম দেখতে পেলুম পিয়ারী বাইজীকে, অমার্জ্জিত ভাষায় যার একমাত্র উপমা হয়—ঠিক যেন গোবরের পাঁকে পদ্ম ফুল ফুটেছে।

গান-বাজনার আসর চলেছে, রসজ্ঞ সমঝদার কেউ নেই, দিন হাজার টাকা সেলামী দিয়ে সুন্দরী বাইজী পিয়ারী মুজরা করতে এসেছে, পনের দিনের কড়ারে,—কিন্তু গান কে শোনে ? আর বোঝেই বা কে ?

শ্রীকান্তকে সমঝদার শ্রোতা পেয়ে বাইজী তাকেই কেন্দ্র ক'রে তাঁর যত শিল্পী-কুশলতার পরিচয় দিচ্ছেন। দুপুর রাতে আসর ভাঙলো। সকলে নেশায় অচেতন—জেগে আছে দু'টি প্রাণী—বাইজী আর শ্রীকান্ত, আর চারিদিকে জমাট সুরের ঝঙ্কার। রাত্রে বাইজী বাসায় ফেরবার সময় বারান্দায় শ্রীকান্তকে একলা পেয়ে ভৎর্সনা করে বললে—কালই আপনি চলে যাবেন। লজ্জা করে না আপনার বড়লোকের মোসায়েবি করতে ? শ্রীকান্ত অবাক হয়ে গেলেন ! কে এই নারী, যে মুখের উপর এত বড় কথা বলতে পারে, অথচ তাকে ত চিনতে পারছি না ! চিনতে তিনি পারলেন না। পরদিন বাইজীর খাস খানসামা

রতন এসে তাঁকে বাইজীর সেলাম জানিয়ে ডেকে নিয়ে গেল। সেখানে তাঁর পরিচয় পেলেন—যার ছবি আমরা দেখেছি দেবদাসের পাঠশালায় ম্যালেরিয়ায় মরমর, পেট-জোড়া পিলে একটা মেয়ে—যে কোন একদিন পাকা বৈঁচি ফলের মালা তাঁকে পরিয়ে দিয়েছিল ; তিনি অবিশ্যি সে পাকা-বৈঁচি ফলের মালা তখনি খেয়ে ফেলেন। পরে এই টিরটিরে মেয়েটি রোজ রোজ পাকা বৈঁচির মালা না দিলে, পড়া না বলার অজুহাতে বেশ প্রহার দিতেন—এই সুবাদে তিনি ছিলেন পাঠশালার সর্দ্দার পড়ো, অতএব তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈহিক ও নৈতিক চরিত্রের উপর সজাগ দৃষ্টির পরিচয় যখন-তখন দেওয়া দরকার। সেই পেট-জোড়া পিলে মেয়েটি ও তার বোনের গ্রামেরই এক সমৃদ্ধ গৃহস্থের কুলীন পাচক ব্রাহ্মণের সাথে—মেয়ে দুটির খুড়োই বোধ হয়—হাত পা' ধরে পঁচাত্তর টাকায় রফা করে দুটি বোনকে পাত্রস্থ ক'রে নিজেদের কুল, শীল, মান বাঁচান। তারপর শুনে-ছিলেন—এই দু'টি মেয়ে মরে গেছে। এই ছোট বোন—যার নাম রাজলক্ষ্মী—এর সম্বন্ধে শ্রীকান্তের মনে এক তাকে প্রহার করা ও শাসন করা ছাড়া অন্য কোন ভাব কোনদিন উদয় হয় নি। পিয়ারী বাইজী ডেকে নিয়ে সব কথা শ্রীকান্তকে বলে বললো—তুমি আমাকে চিনতে পারনি, কিন্তু যেদিন আমি তোমার গলায় পাকা বৈঁচির মালা দিয়েছি সেইদিন থেকেই আমি তোমাকে বর বলে জেনেছি। শ্রীকান্ত সত্যের এই ভয়াবহ প্রকাশ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সর্ব্বনাশ!

এ বলে কী ? এই ভাবেই ভবঘুরের জীবনে দ্বিতীয় নারীর আগমন হলো অযাচিতে ও অজ্ঞানাতে। কিন্তু তার মন তখন অন্নদাদিদির স্মৃতিতেই ভরপূর। অন্য নারীর চিন্তা তাঁর মনে স্থান পাবে কেন ?

দু'দিন পরে কুমার সাহেবের মজলিশে—রাজরাজড়ার অলস আড্ডায় যা হয়—ভূতের গল্প আরম্ভ হলো, শেষে গড়ালো গিয়ে বাজীতে—কাছে যে মহাশ্মশান আছে সেখানে অমাবস্যার গভীর রাতে কে একলা যেতে পারে ?

শ্রীকান্ত বললে, আমি যাবো—তবে সঙ্গে বন্দুক থাকবে। যখন শ্রীকান্ত বাজী রেখে শ্মশানে যাবার জন্য ঠিক করে ফেলেছে—আবার তার ডাক পড়লো রতনের মারফত পিয়ারী বাইজীর কাছে। পিয়ারী যখন দেখল, তার অনুরোধ-উপরোধে কোন ফল হলো না, তখন সে কেঁদে ফেললো এই বলে যে, আমাকে আর দুঃখ দিও না। অবিশ্যি তার চোখের জলের বাজে খরচই হলো। ভবঘুরে শ্রীকান্ত দুপুর রাতে শ্মশানে গিয়েছে—পিয়ারীর মন মানে না। একমাসের মাহিয়ানা অগ্রিম বক্‌শিশ দিয়ে, সে তার দু'জন দারোয়ান, তার খাস চাকর রতন ও গ্রামের চৌকিদারকে শ্মশানে পাঠালো শ্রীকান্তকে আনবার জন্য।

দু'দিন পর পিয়ারী বাইজী তার মুজরা সেরে, পাটনা ফেরবার পথে শেষ রাতে ভোরের আগে শ্রীকান্তকে একলা আবার শ্মশানে দেখতে পেয়ে কাঁদাকাটি, অনুনয়-বিনয় করে তাকে

সঙ্গে নিতে চাইলো। যেটার রূপ দেওয়া যায় একমাত্র ইংরেজী শব্দে—পিয়ারী বাইজী শ্রীকান্তের সাথে Elope করতে চাইলো। শ্রীকান্ত রাজী হলো না, কিন্তু তার চোখের জল ও হাত-পা' ধরা অনুরোধে পিয়ারী বাইজীর বাড়ি পাটনা যেতে স্বীকার করলো। তার পরদিন শ্রীকান্তও চলে গেল—পাটনা না গিয়ে পাটনার কাছাকাছি ক্রোশ-দশ দূরে নেমে পড়লো ও এক ভবঘুরে সাধুর দলে ভিড়ে পড়লো। তখন শ্রীকান্তের রূপান্তর হলো—গলায় হাতে রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে পেতলের তাগা, পরনে গেরুয়া, সে ভিক্ষাও করে, চা ও সিদ্ধি খায়। এই ভ্রাম্যমাণ সাধুদের ঘোড়া, উট, ছাগল ও তাঁবু ছিল। বেদে শ্রীকান্ত এই বেদের দলেই ভিড়ে পড়লো। সাধু হয়ে ঘুরতে ঘুরতে শ্রীকান্ত এসে পড়লো আরায়—তখন সেখানে বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। এক বাঙালীর বাড়িতে বসন্ত হয়ে তার ছেলেটি মারা গিয়েছে। বাড়ির সব ঐ অসুখে আক্রান্ত—শ্রীকান্ত লেগে গেল তাদের শুশ্রূষায়। মহামারীর জন্য সেবা ঠিকমত হচ্ছিল না, সাধু তাই সেখান থেকে তাঁবু গোটালেন। শ্রীকান্ত রয়ে গেল। তার হলো বসন্ত। স্টেশনের ধারে এক টিনের ছাপরায় শ্রীকান্ত আশ্রয় নিলে। পিয়ারী খবর পেয়ে পাটনা থেকে এসে অচেতন শ্রীকান্তকে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করে বাঁচিয়ে তুলে সঙ্গে করে পাটনায় নিয়ে গেল। সেখানেও এই নারীর প্রেম-নিবেদন চললো এই ভবঘুরের উপর এবং তার প্রেম বাস্তব আকার নিলো তার অকুণ্ঠ সেবাপরায়ণতার মধ্যে দিয়ে—যার

পেছনে কেবল এই কথাই মাথা খুঁড়ে মরছে, তোমার গলায় আমি মালা দিয়েছি, তুমি ছাড়া আমার কে আছে? তুমি আমার। যেন ঠিক আদালতে স্বত্বের মামলায় কোনদিন শ্রীকান্তের উপর রাজলক্ষ্মীর স্বত্ব সাব্যস্ত হয়েছে—সেটা আর কিছুতেই ওলটান যায় না। কিন্তু শ্রীকান্তের এই গায়ে-পড়া প্রেম ভাল লাগলো না, অথচ তার অবচেতন ও চেতনাময় অনুভূতি এই নারীর একনিষ্ঠ প্রেম-নিবেদন দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। সে শুধু ভাবতে লাগলো, এবার পালাই, তা না হলে আমি বাঁধা পড়ে যাবো—এই নারীর কাছে আমার গতি বন্ধ হয়ে যাবে। তিনি একটু সুস্থ হয়েই বর্ম্মা চলে গেলেন নিজের রোজগারের জন্য—রাজলক্ষ্মীর কোন অনুরোধ-উপরোধ শুনলেন না। এই মন নিয়েই তিনি বর্ম্মা গেলেন।

জাহাজে দেখলেন নন্দমিস্ত্রী, টগর, অভয়া ও রোহিণী। তাছাড়া সমুদ্রে ঝড়ের বর্ণনা তিনি যা করেছেন—সেটা অনবদ্য, সাহিত্যের দিক দিয়েতো বটেই, আর তাঁর ভবঘুরে মনের দিক দিয়েও কেবল অনবদ্য নয়, তুলনাহীন। বিশাল পর্ব্বতের মত ঢেউগুলি আসছে। তাদের সফেন শুভ্র মাথায় হিমালয়ের তুষার-ধবল শৃঙ্গের মতই জ্বলছে হীরে মাণিক—যাকে আমরা বলি ফসফরাস; আর একমিনিট, তার পরেই সব শেষ—কিন্তু এই শেষের সময়ও মৃত্যুর এই করাল ভয়ঙ্কর রূপ দেখে তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হচ্ছেন। এইখানেই তাঁর সত্যিকার শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

পরিচয় পেলেন হাতে হাতে—যখন তারা দেখলেন তিন চারটি বর্ম্মি মেয়ে গাড়োয়ানের সাথে ভাড়া নিয়ে বচসা হওয়ায়, সামনের আখের দোকান হতে আখ নিয়ে গাড়োয়ানকে কি এলোপাথাড়ি মারছে! এই দৃশ্যের মূল্য মনের উপর অনেকখানি কাজ করেছিল তিন জনেরই—বিশেষতঃ অভয়ার। মনে রাখতে হবে, সে এসেছে তার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে খুঁজতে—যে স্বামী তার কোন খোঁজ করে নি আজ সাত-আট বছর—চিঠির জবাবও দেয় না।

শ্রীকান্তের দ্বিতীয় ভাগ অভয়ার কথাতেই ভরা; আর মাঝে মাঝে রাজলক্ষ্মীর কাছে চিঠি লিখে মন ও মতের যাচাই চলেছে এই ভ্রাম্যমাণের। যাক্, শ্রীকান্ত তো এসে উঠলেন "দাদাঠাকুরের হোটেলে।" হোটেলটার আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতি আছে অর্থাৎ ভারতের যত জাতি, তাঁরা নির্ব্বিচারে এখানে পাত পাড়েন—তবে বামুনের স্থান সকলের উপরে, কারণ সে বর্ণের গুরু। হোটেলের মালিক উদার, অমায়িক—তিনি ব্যবসা বোঝেন। ভাবী চাকুরীর উমেদারদের তিনি বলেন, যতদিন চাকুরী না পান আপনি থাকেন, খান-দান—পয়সা দিতে হবে না। চাকুরী হলে সব মিটিয়ে দেবেন। অবিশ্যি শ্রীকান্ত তিন-চার মাস চাকুরী পায়নি—খোঁজাখুঁজি চলেছে, তখন দেখা গেল তরকারির সংখ্যা কমে আসছে। পরে তাদের পরিমাণের স্বল্পতাই চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়—আমরাই নোটীশ দিচ্ছি। বুঝলে, আর এইভাবে বেশীদিন চলবে না! শ্রীকান্তকে

এইভাবে নোটীশ দেওয়া হলো—তবে তিনি শেষ বোঝবার আগেই চাকুরী জুটে গেল। বইখানি আদর্শ জীবন্ত ছন্নছাড়া ভবঘুরের জীবন সব দিক দিয়ে।

যে অভয়ার কথা বলতে অন্য কথা এসে গেল—এটাতে সেই অভয়ার পরিবেশ ভাল বোঝা যাবে। ওদিকে অভয়া ও রোহিণী ছোট একটি বাসা ভাড়া নিয়েছে। অভয়া রোহিণীদাদার সাহায্যে তার হারাণ স্বামীর খোঁজাখুঁজি করছে। শ্রীকান্ত অবশ্য সাহায্য করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। কিন্তু বিদেশ, অজানা জায়গা—বললেই তো আর নিরুদ্দিষ্ট লোকের খোঁজ পাওয়া যায় না। মাত্র এইটুকু জানা ছিল, অভয়ার স্বামী বর্ম্মায় রেলে কাজ করতো! এইটুকু মাত্র সম্বল নিয়ে এই নারী তার স্বামীর উদ্দেশে অজানার পথে পা' বাড়িয়েছে—কেবল এইটুকু জানবার জন্য যে, সে বেঁচে আছে কিনা?

বেঁচে থেকে যদি অভয়াকে আর সে না নেয়, তার সাথে আর ঘরকন্না না করে, তাতেও অভয়ার দুঃখ নেই—সে ভাল আছে, বেঁচে আছে—এইটুকুই তার পক্ষে যথেষ্ট! সে আর কিছু চায় না।

নারীর এই একনিষ্ঠ প্রেম আসে কোথা হতে? আর তাদের এই প্রেমই বা হয় কাদের জন্য—যারা মাতাল, বদমায়েশ ও নারীর মর্য্যাদা কোনদিন দেয়নি! এ-সমস্যার সমাধান এ পর্য্যন্ত হয় নি, শিল্পীও করতে পারেন নি।

অভয়া-চরিত্রের পরিকল্পনা দাদার মনে কি ভাবে এসেছিল,

তার নিজের মুখে যা শুনেছি সেটা এই রকমের। ঐ রকমই মিস্ত্রী-শ্রেণীর একজনের স্ত্রী ছিল অভয়ার মতই—সেই রকম সুন্দরী ও মার্জ্জিতরুচি। লোকটি ছিল মাতাল, অন্য রমণীতে আসক্ত ও স্ত্রীকে ধরে মারত। এই রকম মেয়ের চাহিদা আছে। জুটে গেল তার একজন পূজারী। সে তাকে ভালবাসতো এবং এই দুশ্চরিত্র ও অত্যাচারী স্বামীর হাত থেকে সব সময়ই বাঁচাবার চেষ্টা করতো। তার স্বামী যখন মদ খাবার টাকার জন্য তার স্ত্রীকে মারধর করতো, এই লোকটি তার বন্ধুকে টাকা দিয়ে মার থেকে বাঁচাতো। সেই মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গে নিষ্ঠুর মারের ক্ষত-চিহ্ন, শতগ্রন্থি ছিন্ন-মলিন বসন—এই ছিল তার আজীবন রূপ-সজ্জার প্রসাধন ও হাতে দু'গাছি শাঁখা, কপালে সিন্দুরের রক্ত-তিলক। তার স্বামীর এত অত্যাচার-উৎপীড়ন ও তার বন্ধুর শত অনুনয়-বিনয়, মান-অভিমান ও চোখের জল সত্ত্বেও কিছুতেই সে ঐ স্বামীকে ছেড়ে, তার সাথে স্বামী-স্ত্রীর মত বসবাস করতে রাজী হয় নি। তাদের দু'জনের মধ্যে সত্যিকার ভালবাসা ছিল। দুঃখের নিকষে তাদের ভালবাসার পরখ দু'জনের মনেই হয়েছিল—সেটা তারা খাঁটি সোনা বলেই জানতো। কারণ পুরুষের পক্ষে ত্যাগ ছিল, দুঃখ বরণ ছিল—শুধু টাকা-গহনা দিয়ে প্রলুব্ধ করবার মতলব ছিল না। এইভাবে তারা অনেকদিন দু'জনে দু'জনের মুখ চেয়ে ছিল—শেষে অনিয়ম ও অত্যাচারে ঐ স্বামী মহাশয়ের ক্যানসার বা গ্যাংগ্রীনের মতই একটা কিছু হয়। দাদাকে বলতে শুনেছি, রোগীর ঘরে মানুষ ঢুকতে পারে না, দুর্গন্ধে সর্ব্বাঙ্গ

খসে পড়ছে তার নিদারুণ ক্ষততে। কিন্তু ঐ নারী কী নিষ্ঠার সাথেই না তার সেবা-শুশ্রূষা করলে এবং পরে সে মারা গেলে, এলো তার প্রণয়ীর কাছে—যে এতদিন তারই আশাপথ চেয়ে বসেছিল।

অভয়াও ঠিক এই ছাঁচে ঢালা। তার একমাত্র ইচ্ছা—তার স্বামীকে একবার দেখা এবং জানা, সে কেমন আছে ও বেঁচে আছে কিনা! যদি তার স্বামী—যেটা খুবই সম্ভব—অন্য স্ত্রী নিয়ে ঘর করছে দেখে, তখন সে কি করবে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে—আমিও তার কাছেই থাকবো, তাদের সেবা করবো—কোন হিংসা করবো না—তার ছেলেপুলে মানুষ করবো। নারীর এই মনোভাব—'শেষ প্রশ্নে' কমল যেটাকে বিদ্রূপ করছে—কুষ্ঠরোগী স্বামীকে পিঠে করে স্ত্রীর রূপসী গণিকার বাড়ি নিয়ে যাওয়ার গল্প, সেটি মিথ্যে। মিথ্যে এই জন্য যে, স্ত্রী না হয় পতি-দেবতার সন্তোষের জন্য তাকে পিঠে করে ঐ রকম অস্থানে নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু যে অবিদ্যার বাড়িতে এই কুষ্ঠরোগী যাচ্ছে, তাকে তিনি ঘরে ঢুকতে দেবেন কেন? গল্পের গোঁজমিল ঐখানে। তবে এই সব নারীর শত বিরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেও স্বামী-দেবতাকে আঁকড়ে থাকার চেষ্টার অন্তরালে এই মনোভাবেরই আভাস পাওয়া যায়। আমি কিন্তু এই সব নারীর মনোভাবের মধ্যে দেখতে পাই, কবি কালিদাসের একখানা নাটকের অতীত যুগের একটি স্পষ্ট ছবি—যেটা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নারী-হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়েছিলো এবং সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর গল্পের ভেতর

দিয়ে আজও তার অবচেতন মনে সেটা বদ্ধমূল আছে। সত্যিই আছে।

গল্পটি এই ঃ—এখন যেমন আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ চালু হয়েছে —দেশে দেশে দূত বিনিময়, বাণিজ্য ও মিত্র-শক্তিকে যুদ্ধে সাহায্য, টাকা ধার দেওয়া প্রভৃতি—তখনকার দিনে তেমনি একমাত্র ভারতবর্ষই ছিল সভ্য, আর সব জাতি—এক মিশর ও চীন ছাড়া —ছিল অসভ্য। পরে অবশ্য গ্রীস ও রোমানরা আসে।

আমাদের গল্প যে সময়ের, তখন মিশর ছিল হয়তো খুব সভ্য। যাক, তাতে কিছু আসে-যায় না। কিন্তু মানুষের মন অন্য জাতির সাথে আদান-প্রদান ও সৌহার্দ্দ্য করতে চায়। যোগাযোগের জন্য তাঁরা আকাশে উড়তে লাগলেন প্লেনে বা এটমিক-শক্তির মত ঐ রকমই কোন শক্তি-চালিত যান্ত্রিক-যানে। আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ ছিল না বটে, তবে আন্তগ্রাহিক (interplanatory) সম্বন্ধ স্থাপিত হলো। এইরকম কোন এক যুদ্ধ-অভিযানে স্বর্গের দেবতারা ও তাঁদের রাজা ইন্দ্র সাহায্য চেয়ে পাঠালেন মর্ত্ত্যের রাজা বিক্রমদেবের কাছে। তখনকার দিনে যুদ্ধ অবশ্য দেবতা ও দানবের মধ্যেই হতো—এখনও তাই হয়। যার নাম বর্ত্তমানে আমরা দিয়েছি—friend and enemy অর্থাৎ মিত্র ও শত্রু। যুদ্ধের সাথে মেয়ে-চুরিও হতো—এখনও হয়। দানবেরা স্বর্গ অধিকার করে সেখানকার সেরা সুন্দরী উর্ব্বশীকে চুরি করে নিয়ে গেছে। রাজা বিক্রমদেব তাদের যুদ্ধে হারিয়ে উর্ব্বশীকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন তাঁর প্লেন-রথেই। তবে সেটা ছিল দুজনের বসবার

মত (two-seater) রথ। মেঘলোকের সারা পথ তাঁরা দুজন দুজনের গা ঘেঁষেই বসেছিলেন। উর্ব্বশীর শিক্ষা-সংস্কৃতি খুব উচ্চাঙ্গের ছিল। তাই তিনি সারা পথ অচেতন হয়েই ছিলেন রাজার দেহ আশ্রয় করে। উর্ব্বশী কিন্তু রাজার এই পরশটুকু ভোলেন নি। রাজ্য-জয়ের পরে যা হয়ে থাকে—বিজয়-উৎসব, পান-ভোজন, নাচ-গানের মজলিশ—তাই চলেছে। সেখানে রাজা বিক্রমদেব প্রধান অতিথি বা chief guest. উর্ব্বশী মন-মরা হয়ে আছেন, বারে বারে আড়চোখে কেবল রাজা বিক্রমদেবকেই দেখছেন। ব্যাস, আর যায় কোথা? তাঁর নাচের তাল কেটে গেল! ভরতমুনি ছিলেন এই জলসার পরিচালক। নাচের তাল-কাটা! এত বড় অপরাধ তিনি সইলেন না। শাপ দিলেন, পৃথিবীতে নির্ব্বাসন! স্বর্গে ভালবাসা, প্রেম বলে কিছু নেই। সুন্দরী সুন্দরী যত নারী, তাদের সব জাতীয় সম্পত্তি বলে গণ্য করা হয়েছে (nationalisation)। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মত ব্যক্তিগত নারীর কথা কেউ সেখানে ভাবতেও পারে না। সুতরাং এ একেবারে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অপরাধ (offence against state)। উর্ব্বশীর কান্নাকাটিতে কোন ফল হলো না। Disciplinary action নিতেই হবে। উর্ব্বশীর এক বৎসরের জন্য পৃথিবীতে নির্ব্বাসনের হুকুম হলো। যার মানে হচ্ছে, রাজা বিক্রম তাঁকে স্বর্গ থেকে elope করলেন।

মর্ত্ত্যে এসে চললো রাজা বিক্রম ও উর্ব্বশীর প্রেম। প্রেমের যত রকম অভিব্যক্তি ও উপচার থাকতে পারে, তার বর্ণনা

কালিদাস নিখুঁতভাবে দিয়েছেন *। আসল গল্পে এখনও আমরা আসিনি। উপরেরটুকু নিছক কামনা-বাসনার উন্মাদনা। ওদিকে বিক্রমদেবের যে রাণী আছেন, তিনি সব জানছেন, সব বুঝছেন, সব দেখছেন। তিনি স্বামী-পরিত্যক্তা হয়ে নীরবে চোখের জল ফেলছেন। কিন্তু তাঁর এই দুঃসহ দুঃখেই তাঁর মধ্যে নারীর লাঞ্ছিত মর্য্যাদা জেগে উঠলো। তিনি 'প্রিয় প্রসাধন ব্রত' আরম্ভ করলেন—যার মানে এই হয়, আমি যাকে ভালবাসি, যিনি আমার স্বামী, তিনি যতই অন্য রমণীতে আসক্ত হোন না কেন, আমি তার জন্য ক্ষোভ করবো না, ঈর্ষা করবো না, মনেও কোন গ্লানি আনবো না। আমি যেন তাঁকে ভালবাসতে পারি। এক বৎসর তিনি এই ব্রত পালন করলেন। তারপর তিনি ব্রত উৎযাপনের দিন দেহে, মনে ও কথায় নিজেকে সংযত করে রাজাকে নিমন্ত্রণ করে পাঠালেন। রাজা এলে, তাঁর পা ধুইয়ে, তাঁর গলায় মালা ও কপালে চন্দন দিয়ে, তাঁর অর্চ্চনা করে বললেন—তোমার কাছে আমি এই বর চাইছি, যেন তোমার কোন কাজে আমার কোন ক্ষোভ না হয়। আমি যেন তোমার দেওয়া সব দুঃখ অবিচলিত হয়ে সইতে পারি।

রাজার তখন চোখ খুললো। এদিকে উর্ব্বশীরও মেয়াদ ফুরিয়েছে, তাঁকে স্বর্গে ফিরতে হবে। অবশ্য উর্ব্বশীর বিরহে কবি কালিদাস এখানে প্রিয়-বিরহী রাজার যে ছবি এঁকেছেন, তার কাছে মেঘদূতও হার মেনে যায়। কী করুণ বিলাপ তাঁর! কখনও বা চাঁদের আলোকে উর্ব্বশীর শাড়ির আঁচল ভেবে

* কবি কালিদাসের বিক্রম-উর্ব্বশী নাটক।

'উর্ব্বশী! উর্ব্বশী!' করে ছুটেছেন তাঁকে ধরতে—আবার কখনও বা ফুল দেখে প্রিয়ার মুখ মনে করে মূর্চ্ছা যাচ্ছেন। কিন্তু রাণী রাজার এই উন্মাদনার সময় তাঁর কাছ কাছে থেকে তাঁকে সান্ত্বনাই দিচ্ছেন! রাণীর পতি-প্রেমই শেষে জয়ী হলো। রাজা-রাণীর মিলন হলো।

অভয়ার মধ্যে আমরা নারীর সেই সনাতন মনোবৃত্তিই দেখতে পাই।

তারপর চললো তার স্বামী খোঁজা। কিন্তু খুঁজলেই তো আর পাওয়া যায় না। শ্রীকান্তের চাকুরী হবার পর হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের প্রোম না ভামো এই রকম কোন মফঃস্বল অফিস হতে রিপোর্ট এলো—একজনের বিরুদ্ধে—যে আগে রেলে চুরি করে পালিয়েছিল এবং বর্ত্তমানেও অফিসের কাঠের কারবারে সে টাকা তছরূপ করায়—বিচারের ফাইল এসে পড়েছে শ্রীকান্তেরই হাতে। শ্রীকান্ত বুঝলো, এই-ই অভয়ার স্বামী। সে জানতো, এই বীরপুরুষ নিশ্চয় তার কাছে আসবে এই কেসের তদ্বির করতে। এলোও তাই। নোংরা, অপরিষ্কার, রুক্ষ চেহারা, মুখের দু'কস বেয়ে পানের রস গড়িয়ে পড়ছে, এমন একজন লোক ময়লা হাফ-প্যান্ট ও হাফ-সার্ট পরে এসে শ্রীকান্তের নিকট কত কাঁদাকাটি, অনুনয়-বিনয় ও শেষ পর্য্যন্ত প্রলোভন দেখাতে শুরু করলো। তাতেও শ্রীকান্তের মন গললো না। শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি বিবাহিত ?

—নিশ্চয়ই স্যর, হাঁ, হাঁ! জানেনই তো স্যর, এদেশে পড়ে আছি এবং দেশের সাথে সংস্রব নেই বলে এই দেশেরই একটি মেয়ে বিয়ে করে, কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে ঘর-সংসার করছি। চাকুরি গেলে তারা সব না খেয়ে মরবে।

শ্রীকান্ত জিজ্ঞাসা করলো, আপনি দেশে বিবাহ করেছিলেন কি?

—কখনো নয়। দেশের সাথে আমার কোন সংস্রবই নেই। দেশে আমার অমন রাজার মত বাড়ি-বাগান, জমি-জমা সব জ্ঞাতিদের বিলিয়ে দিয়ে চলে এসেছি। তারাই সব ভোগ করুক।

পরে শ্রীকান্ত আবার বললো—আপনার স্ত্রী অভয়া আপনার খোঁজে এখানে এসেছেন।

প্রথমে শুনে সে আঁৎকে উঠলো, পরে হাত কচলে হা হা করে হেসে বললে—তাইতো! বিয়ে অবশ্য অনেক আগেই করা হয়েছিল—তা তিনি যদি বেঁচেই থাকেন, আর এখানে এসে থাকেন, ভাল কথা।

শ্রীকান্ত বললো—তিনি যদি আপনাকে ক্ষমা করেন ও আপনি যদি তাঁকে নিয়ে ঘর করেন, তবে আপনার এবারকার অপরাধ মাপ করতে পারি।

—এ আর বেশী কথা কি? স্ত্রী—ধর্ম্মপত্নী। তাঁর সাথে ঘর করবো, এ তো আমার সৌভাগ্য! তবে তিনি কি এই নোংরা, ইতর, ম্লেচ্ছ বর্ম্মী—যাদের জাত-বিচার নেই—তাদের সাথে থাকবেন?

—আপনি রাখলেই থাকবেন।

—আমি নিশ্চয় রাখবো। আমার স্ত্রীর ঠিকানাটা দিনতো স্যর। ওঃ! কতদিন তাকে দেখিনি! বলে এই স্বামী-মহাশয় রুমালে চোখ মুছলো।

শ্রীকান্ত তাকে ঠিকানা দিল। সন্ধ্যার সময় শ্রীকান্ত অভয়ার বাড়ি গিয়ে, সব কথা তাকে খুলে বলে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি আমাকে ক্ষমা করতে বলো?

—বলি।

—তুমি ওর কাছে যাবে?

—যাবো।

অভয়া আর কোন কথা বললো না। শ্রীকান্ত বলছে, অভয়া আঁচলে চোখ মুছলো।

শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী-চরিত্রের মধ্যে একমাত্র অভয়াই সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে নি। অভয়ার মনে ছিল পতি-প্রেমের একনিষ্ঠতার আদর্শ। স্বামী যাই হোক, তাকে বিচার করবার কিছুই নেই—স্ত্রী তাকে ভালবাসবেই। এই আদর্শ-বাদের জন্যই সে রোহিণীর অমন একনিষ্ঠ প্রেম ও আত্মত্যাগকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। অভয়া তার স্বামীকে ক্ষমা করাতে, তার স্বামী চাকুরীতে বহাল হলো ও অভয়াকে সঙ্গে নিয়ে তার কর্ম্মস্থানে গেল। কিন্তু স্বামী তাকে নিয়ে গিয়ে রাখলো গ্রামের এক পোষ্টমাষ্টারের বাসায়। কারণ তার বর্ম্মী-স্ত্রী তাকে বাড়িতে ঠাঁই দেবে কেন?

অভয়া ফিরে না আসা পর্য্যন্ত তার রোহিণীদার দুঃখে সত্যই

আমাদের চোখে জল আসে। শ্রীকান্ত গিয়েছিল তাকে বলতে যে, অভয়া স্বামীর ঘর করতে গিয়েছে; তাকে টাকা পাঠানোই বা কেন? আর চিঠি লেখাই বা কেন? কিন্তু শ্রীকান্ত গিয়ে রোহিণীদার যে-অবস্থা দেখলো, তাতে তার ঐ কথা বলবার সব ইচ্ছা চলে গেল। শ্রীকান্ত গিয়ে দেখলো—

সারা বাড়ি অন্ধকার, আলো জ্বলে নি, কোথাও জনপ্রাণী নেই। শেষে সে খুঁজতে খুঁজতে রান্নাঘরে গিয়ে দেখলো, অন্ধকারের মধ্যে কে একজন লোক দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা দিয়ে উবু হয়ে বসে আছে। উনুনটা নিভে গেছে—তার উপর এক কড়াই চাপানো।

এ-দৃশ্য দেখে শ্রীকান্তর চোখের জল বাধা মানলো না। শ্রীকান্ত রোহিণীকে বললে—একটা হোটেল থেকে খাবার আনানোর বন্দোবস্ত করলেই তো পারেন! আর এখানে থাকবারই বা কি দরকার?

অভয়ার স্মৃতি যেখানে ছড়ান আছে, সেখান ছেড়ে রোহিণী গেলো না, যেতেও পারলো—না তাতে তার খাওয়া হোক, চাই না হোক! প্রেমের এই একনিষ্ঠ সাধককে দেখে মনে পড়ে কবির কথা। তিনি কচ ও দেবযানীতে যা বলেছেন দেবযানীর মুখ দিয়ে, তার ভাবার্থ এই হয়—নারীর লাগিয়ে সাধনা করেনি কেহ? তার পরই বলছেন—সহস্র বৎসরের সখা! সাধনার ধন! নারীর মন!

অমনি একদিনে পাওয়া যায় না—মোটরে তুলে, সিনেমা বা

হোটেলে খাওয়ালেও নয়, বাড়ি বা গহনা দিলেও নয়। রোহিণীর প্রেমের এই সাধনা দেখে আমাদের মনে পড়ে ভারতের সনাতন প্রেম-সাধনার একটা দিকের কথা। নারীকে পাবার জন্য পুরুষের কি আকুতি! বৃন্দাবনে শোনা যায়—এখনও আমরা আমাদের হৃদি-বৃন্দাবনে অহরহই যা শুনতে পাই—নরের নারীর জন্য কী ব্যাকুলতা—রাধে! রাধে!

রাধানামের সাধা বাঁশী হয়তো বৃন্দাবনে আজও বাজে। হয়তো কয়েকজন মাত্র ভাগ্যবান তাই শুনতে পায়। আমরা কিন্তু আমাদের হৃদি-বৃন্দাবনে সব সময়েই শুনতে পাই রোহিণীর প্রেম-সাধনা! রোহিণীর এই প্রেম-সাধনাই হলো আমাদের অন্তরের শিল্পীর মনের প্রতিচ্ছবি বা projection।

রোহিণীর যখন এই অবস্থা, তখন অভয়া কী করছিল?

একনিষ্ঠ স্বামী-প্রেমের পুরস্কারের ছাপ তার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতের মুখে ঝরে পড়ছিল।

অভয়া ফিরে এলো নতুন রূপে, দেহে ও মনে। শ্রীকান্ত জানতো না অভয়া ফিরে এসেছে। ডাকাডাকিতে অভয়া দোর খুলে দিয়েই ভেতরে চলে গেল—যেন লজ্জা পেয়ে! তার পরই নিজেকে দৃঢ় করে আবার হাসি মুখে ফিরে এলো।

শ্রীকান্ত অভয়ার মুখে তার স্বামীর ঘর করার ইতিহাস সব শুনলো এবং অভয়া তার দেহে স্বামীর অত্যুগ্র প্রেম-চিহ্নের দাগ দেখালো। শ্রীকান্ত বললে—চলে আসাটা অন্যায় বলতে পারিনে। কিন্তু—

অভয়া বললে—"এই 'কিন্তু' টার উত্তরই তো আপনার কাছে চাইছি, শ্রীকান্ত বাবু! তিনি তাঁর বর্ম্মী স্ত্রী নিয়ে সুখে থাকুন, আমি নালিশ কচ্ছিনে। কিন্তু স্বামী যদি শুদ্ধমাত্র এক-গাছা বেতের জোরে স্ত্রীর সমস্ত অধিকার কেড়ে নিয়ে, তাকে অন্ধকার রাত্রে একাকী ঘরের বার করে দেন, তাহলে তার পরেও বিবাহের বৈদিক-মন্ত্রের জোরে স্ত্রীর কর্ত্তব্যের দায়িত্ব বজায় থাকে কিনা, আমি সেই কথাই আপনার কাছে জানতে চাইছি। তিনিও আমার সঙ্গে সেই মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন। অর্থহীন আবৃত্তি তাঁর মুখ দিয়ে বার হবার সঙ্গে সঙ্গেই মিথ্যায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু সে কি সমস্ত বন্ধন, সমস্ত দায়িত্ব রেখে গেল মেয়েমানুষ বলে শুধু আমারই উপর ?"

স্বামীর এই নিদারুণ ব্যবহারে অভয়ার সতীত্বের আদর্শ ধুলায় মিশে গেল। জাগলো তার মধ্যে নারীর লাঞ্ছিত মর্য্যাদা। এই বিদ্রোহিনী, তেজস্বিনী নারী সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল না। সে সমাজেই রয়ে গেল তার সমস্ত অভিশাপ নিয়ে। শিল্পীর মুখ দিয়ে একদিন এই কথা বেরিয়েছিল— "পতিই সতীর দেবতা কি না, এ বিষয়ে আমার মত ছাপার অক্ষরে ব্যক্ত করার দুঃসাহস আমার নেই এবং তার আবশ্যকতাও দেখিনে।"

আজ সেই কথা সত্য হলো। তারপর অভয়া বলছে—"আমি কিন্তু কিছুতেই বেরিয়ে যাবো না। সমস্ত অপযশ, সমস্ত কলঙ্ক, সমস্ত দুর্ভাগ্য মাথায় নিয়েই আমি চিরদিন আপনাদের হস্তে

থাকবো।" থাকলোও সে তাই। সেইজন্য আমরা দেখতে পাই, শ্রীকান্ত যখন প্লেগ হয়েছে সন্দেহে পীড়িত অবস্থায় তার নতুন পাতা সংসারের দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়ালো, তখন সে তাকে ফেরাতে পারলো না। অভয়া শ্রীকান্তের উত্তপ্ত ললাটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে বলেছিল—"তোমাকে 'যাও' যদি বলতে পারতুম, তাহলে নতুন করে সংসার পাততে যেতুম না। আজ থেকে আমার নতুন সংসার সত্যিকার সংসার হলো।'

অভয়ার কথা শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীকে লিখেছিল। রাজলক্ষ্মী তার জবাবে লিখেছিল—"তাঁহার ভিতর যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহার শিখার আভাস তোমার চিঠির মধ্যে আমি দেখিতে পাইতেছি। তাঁহার কর্ম্মের বিচার একটু সাবধানে করিও।"

জীবনের এই শাশ্বত প্রশ্ন—অভয়া রোহিণীর সাথে যে সংসার পাতলো, তার সার্থকতা বা fulfilment কোথায়?

এটা তার অবচেতন মনের কোন্ প্রেরণা?

এটা কি তার কেবল নারী-সুলভ মাতৃত্বের সহজাত আকাঙ্ক্ষা? না, প্রেমের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করবার দুর্জ্জয় সাহস?

আমরা বলি শেষেরটা। প্রেম যাকে একবার বরণ করে, তখন সে সোনা হয়ে যায়। দুঃখ-বরণ ও ত্যাগের মধ্য দিয়ে সে এগিয়ে চলে। কিছুতেই আর তাকে বাধা দিতে পারে না। তখন হয় সে অপরাজেয় এবং সমস্ত দ্বন্দ্বের অতীত। তখন সে তার শান্ত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সব জঞ্জাল ও আবর্জ্জনাকে দেখতে পায়, তাদের

সত্যিকার কল্যাণ রূপে। জগৎ হয়ে ওঠে তার কাছে মধুময়—কারো বিরুদ্ধে তার কোন অভিযোগ থাকে না। সেইজন্য সে বলছে শ্রীকান্তকে গর্ব্বভরে—"তাদের ভবিষ্যৎ সন্তানগণ অভয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাটাকে দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে না। তাদের 'মা' হয়ে' আমি তাদের এই বিশ্বাসটুকু দিয়ে যেতে পারবো যে, তারা সত্যের মধ্যে জন্মেছে এবং এই সত্যের চাইতে বড় সম্বল সংসারে তাদের আর কিছু নেই।"

রাজলক্ষ্মী

শ্রীকান্তের দ্বিতীয় ভাগে ভবঘুরে শ্রীকান্তের জীবনে রাজলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়েছিল। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থভাগে সমানে চলেছে এই নারীকে কেন্দ্র ক'রে ভবঘুরে-জীবনের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ। একবার শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর কাছ থেকে ছুটে চলে যায় 'পালাই পালাই' ক'রে, আবার ছুটে আসে ঠিকস্বাভাবিক ঘটনা-স্রোতে নয়—ভবঘুরে-জীবনের বিপরীত আবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে স্রোতের ফুলের মত। ঠিক এই বিপরীত আবর্ত্তনের মধ্যে দিয়েই শিল্পী দেখিয়েছেন পিয়ারী বাইজীর জীবনে শ্রীকান্তের আবির্ভাব! সে-কথা আমরা বলেছি। রাজলক্ষ্মী শৈশবে একদিন ফুলের মালার বদলে বৈঁচির মালা দিয়ে তাকে বরণ করেছিল। তারপর তার নিরুদ্দেশ জীবনের অজানা, অনিশ্চিত যাত্রা-পথে কোথায় হারিয়ে ফেলেছিল তাকে—খোঁজও নেয়নি—হয়তো বা

তার কথা মনেও হয়নি। শিল্পীর বিশেষত্ব এইখানেই। শ্রীকান্ত তার ছন্নছাড়া, নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা-পথে একদিন পিয়ারী বাইজীর দেখা পেল। কোথায়? না কুমার সাহেবের বিলাসের মধ্যে—ঐশ্বর্য্যের ভেতরে। পিয়ারী বাইজীও তাকে দেখলো। দেখার সঙ্গে সঙ্গে তার অন্তরে বহুদিনের মৃত রাজলক্ষ্মী আবার মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। তখন থেকেই শুরু হলো পিয়ারী বাইজীর জীবনে নতুন এক অধ্যায়। তখন থেকেই পিয়ারী বাইজীর অন্তরের রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তের ভাল-মন্দ, তার মঙ্গল-অমঙ্গলের ভার তার নিজের হাতে তুলে নিল। আমরা সেটা দেখতে পাই—শ্রীকান্তকে অমাবস্যার রাতে শ্মশানে যাবার সঙ্কল্প থেকে বিরত করবার আপ্রাণ চেষ্টা ও তার মিনতি থেকে। প্রথম দেখাতেই তার অন্তরের রাজলক্ষ্মী বললে—যাওয়া বললেই যাওয়া? যাওতো দেখি! তোমার কিছু হলে, আমি ছাড়া কে তোমাকে দেখবে? শ্রীকান্ত অবশ্য শ্মশানে গেল। রাজলক্ষ্মীর কোন বাধা-নিষেধই সে শুনলো না।

রাজলক্ষ্মীর শ্রীকান্তের প্রতি এই উৎকট আকর্ষণের হেতু মনে হয় গ্রীক পুরাণের একটি গল্প—Appollo flies and Daphine holds the chase-এ্যাপলোদেব দেবী ডফনীর প্রেম হতে দূরে পালাচ্ছেন; আর ডফনী দেবী তাঁর পিছু পিছু তাড়া করে চলেছেন, তাঁকে ধরবার জন্য।

বহুদিন না দেখা—একরকম ভুলে যাওয়াই—হঠাৎ তাকে দেখে তার প্রতি এরূপ আকর্ষণ ও অনুরাগ সম্ভব

হতে পারে কি করে? সম্ভব হতে পারে! সেই জন্যই শিল্পী পিয়ারী বাইজীকে খাড়া করেছেন। নানা অবস্থার ফেরে আজ রাজলক্ষ্মী পিয়ারীতে রূপান্তরিত হয়ে, রূপ ও ঐশ্বর্য্যের মধ্যে সাঁতার দিচ্ছে, অথচ দিনরাত বাইরে থেকে পুরুষের উন্মত্ত লালসা-বাসনাকে ঠেকিয়ে রাখতে রাখতে সে হাঁপিয়ে উঠেছে। সে আর তার বাইজী-জীবনের সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না। তার অন্তরের নারীত্ব পদে পদে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। তখন শ্রীকান্তকে দেখবামাত্র তার মনে হলো, এইতো আমার আশ্রয়, এইতো আমার রক্ষক। কিন্তু সমাজ তার পথে দুর্ভেদ্য প্রাচারের ব্যবধান সৃষ্টি করে তার পথরোধ করে দাঁড়াল। রাজলক্ষ্মীর অন্তর বিদ্রোহী, কিন্তু সে দুর্ব্বল, অসহায়! কিরণময়ী বা অভয়ার মত সে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারলো না, সমাজ ছাড়তেও পারছে না। অথচ যাকে সে চায়, যার মধ্যে তার এতদিনের তৃষিত নারী-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা কল্পনার বাস্তব রূপ নিয়েছে, তাকে একান্ত নিজের বলেও পাচ্ছে না। তার এই দ্বন্দ্ব, তার এই আত্মনিগ্রহ শিল্পী তৃতীয় ও চতুর্থ পর্ব্বে দেখিয়েছেন।

আরা থেকে শ্রীকান্তকে পাটনা আনবার পর শ্রীকান্ত ভাল হলে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে সঙ্কোচ বোধ করছে; তার সৎ-ছেলে বঙ্কু কি ভাববে? তার বঞ্চিত ও ব্যর্থ জীবনের এই দ্বন্দ্ব, রূপ নিতে চাইছে বঙ্কুর মা হয়ে কাল্পনিক মাতৃত্বের আওতায়।

শ্রীকান্ত চলে গেল রেঙ্গুনে। সেখানে শ্রীকান্তের জীবনে প্রধান আকর্ষণ অভয়া। অভয়ার কথা জেনে রাজলক্ষ্মীর বঞ্চিত নারী-জীবন শ্রদ্ধায় তার কাছে মাথা নোয়ালো এই ভেবে যে—হাঁ, এর তেজ আছে বটে। এ নিজের পথ করে নিয়েছে। তার সাথে সাথে তার নিজের অন্তরও দুঃখে ভরে গেল—কই আমি তো পারছি না ?

তারপর নানা আকর্ষণ বিকর্ষণের মধ্যে দিয়ে চললো পাওয়া ও না-পাওয়ার চেষ্টা ও ব্যর্থতা—রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্তের দু'জনের দিক থেকেই। ভবঘুরে শ্রীকান্ত রেঙ্গুন থেকে এসে একান্ত ক্লান্ত হয়েই রাজলক্ষ্মীর কাছে আত্মসমর্পণ করলো। অথচ এর আগেই যেদিন শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিল—লক্ষ্মী ! কি হলে তুমি সুখী হও ? সেদিন রাজলক্ষ্মী বলেছিল—"আমার টাকাকড়ি, ঐশ্বর্য্য সব যদি চলে যায়, আমি যদি নিঃস্ব পথের ভিখারী হই, তাহলে আমি সুখী হই।"

এই কথার অন্তরালে আমরা রাজলক্ষ্মীর মধ্যে দেবদাসের চন্দ্রমুখীর ছায়া দেখতে পাই। রাজলক্ষ্মী বুঝেছিল, তার অতীতের পিয়ারী বাইজীই শ্রীকান্তের সাথে মিলনের একমাত্র বাধা। অতএব যদি চন্দ্রমুখীর মত রিক্ত হয়ে শ্রীকান্তের কাছে দাঁড়ান যায়, তাহলে কি শ্রীকান্ত তাকে দূরে রাখতে পারবে ? সে ধরা দেবেই। কিন্তু সে চন্দ্রমুখীর মত রিক্ত হতে পারলো না। তার অন্তরে ছিল ঐশ্বর্য্যের মোহ। সে অন্য পথ বেছে নিল ; যাকে বলি আমরা—আত্মশুদ্ধি ও ত্যাগ।

ক্লান্ত ভবঘুরে শ্রীকান্তকে নিয়ে, নিভৃতে একান্ত করে পাবার লোভে সে তার পিয়ারী-জীবনের স্মৃতি পাটনার বাড়ী-ঘর সব দান করলো তার সৎ-ছেলে বঙ্কুকে। তারপর বীরভূম জেলার নিভৃত কোনো এক পাড়াগাঁয়ে—যেখানকার সমাজ হচ্ছে, আমরা যাদের ছোটলোক বলি, সেই ডোম, বাউরী, তাদের মধ্যে—বাস করবার জন্য চলে এলো।

রাজলক্ষ্মীর মনের মোড় ফেরবার মুখে তার জীবনে এসে পড়লো আর এক ভবঘুরের স্পর্শ—সে হচ্ছে যুবক-সন্ন্যাসী আনন্দর সঙ্গ। এর উপমা দিতে হলে বলতে হয়—ঠিক কমলের সাথে রাজেনের দেখা হওয়ার মতই।

রাজলক্ষ্মী তখন সারা দুনিয়াটা—যেটা তার অতীত জীবন—নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে, তাদের সংস্রব-শূন্য করে, আত্মস্থ হয়ে নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করছে—বাইরের আব-হাওয়া ও ব্যথা-বেদনা নিয়ে এলো তার সামনে এই তরুণ ভবঘুরে সন্ন্যাসী। সে দেখালো—বাইরের দুনিয়ার সাথে সংস্রব বর্জ্জন করলে প্রেমের সার্থকতা নেই। এই নেতিবাচক জীবন ব্যর্থতারই নামান্তর। তবুও রাজলক্ষ্মীর মন বুঝলো না। সে সুনন্দাকে পেয়ে, তার কাছ থেকে ব্রত, নিয়ম, পূজা, উপবাসে আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে তার পিয়ারী-জীবনের কথা ভুলতে চাইলো। তার ফল হলো শ্রীকান্তের উপর অজানিতে অবহেলা—সে পড়ে রইলো একপাশে অনাদৃত হয়ে—রাজলক্ষ্মীর বর্ত্তমান জীবনের ধারার সাথে যার কোন মিল নেই। ভবঘুরে আবার

বেরিয়ে পড়লো। ঘুরতে ঘুরতে এসে গেল তার নিজ গ্রামে এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে তার ঘাড়ে গছানোর চেষ্টা করলেন তার খুড়ো ও খুড়ীমা এক যুবতী অনূঢ়া কন্যা পুঁটুকে!

ভবঘুরে এবার বিপদে পড়লো। খুড়ো ও খুড়ীমা কেবল কান্নাকাটি করেই নিরস্ত হলেন না, পাড়ার লোক জুটিয়ে অনুরোধ-উপরোধ করে পুঁটুর সাথে শ্রীকান্তের বিয়ে একরকম ঠিকই ক'রে ফেললেন। সে রাজীও হলো নিরুপায় হয়ে; কারণ এই লোকটি ভেতরে ভেতরে ছিল একান্ত অসহায়। তবে সে বললে—আমার একজনের মত নেওয়া দরকার।

তখন রাজলক্ষ্মী কাশীতে তার গুরুদেবের কাছে। মাথার চুল ছোট করে ছেঁটেছে, পূজা-জপ-তপে নিজেকে একেবারে ডুবিয়ে দিয়েছে। শ্রীকান্ত আবার রেঙ্গুন যাবে বলে দেখা করতে গিয়ে—বাহিরের ঘরে বসে—নিতান্ত অপরিচিতের মত খেয়ে চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল; কেউ কারুকে চিনলো না অন্তর দিয়ে। শ্রীকান্ত সব কথা খুলে রাজলক্ষ্মীকে লিখল। এইবার রাজলক্ষ্মীর চৈতন্য হলো। তার অবচেতন মন তার নিজের গড়া সব বাধা-নিষেধ মুহূর্ত্তে গা ঝাড়া দিয়ে ফেলে দিল; আত্মশুদ্ধা পূণ্যনিরতা পিয়ারীর মধ্যে জেগে উঠল সেই আগের দিনের শাশ্বত কুমারী নারী, যাকে এই সব বাইরের আবর্জ্জনা দিয়ে সে গলা টিপে মেরে ফেলতে চেয়েছিল এতদিন। সে সইতে পারলো না যে তার শ্রীকান্ত অন্যের হবে। যদি শ্রীকান্ত চলে যায়, তবে তার

রইল কি ? শ্রীকান্তের চিঠির জবাবে সে লিখল, 'যদি কখনো অসুখে পড়ো, দেখবে কে—পুঁটু ? আর আমি ফিরে আসবো তোমার বাড়ীর বাইরে থেকে চাকরের মুখে খবর নিয়ে ? তারপরও বেঁচে থাকতে বলো নাকি ?'

তারপর রাজলক্ষ্মী লিখলো, 'ভেবেছো বুঝি, হঠাৎ তোমাকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলুম ? কুড়িয়ে তোমাকে পাইনি। পেয়েছিলুম অনেক আরাধনায়। তাই বিদায় দেবার কর্ত্তা তুমি নও, আমাকে ত্যাগ করার মালিকানা স্বত্বাধিকার তোমার হাতে নাই।' তার সকল গর্ব্ব, অহঙ্কার এক মুহূর্ত্তে ধুলোয় মিশে গেল। সে চলে এলো নিজে কলকাতায় শ্রীকান্তের কাছে।

রাজলক্ষ্মী বললে, 'ভেবেছিলুম জলের ধারা গেছে কাদায় ঘুলিয়ে, তাকে নির্ম্মল আমাকে করতেই হবে। কিন্তু আজ যদি তার উৎস শুকিয়ে যায়, তবে যাক না আমার জপ, তপ, পূজা, অর্চ্চনা—থাকলো সুনন্দা, থাকলেন গুরুদেব।'

পুঁটির বিয়ের টাকা শ্রীকান্ত দিতে চেয়েছিল জরিমানা হিসাবে—তার সংখ্যা কম নয়, আড়াই হাজার। পরে অবশ্য তার বাক-চাতুর্য্যে বরের বাপকে বশ মানিয়ে আর সেটা দিতে হয়নি, তবে পুঁটুর বিয়েতে গিয়ে ভবঘুরের আবার দেখা হ'ল, কমললতার সাথে মুরারিপুরের আখড়ায়। সে-কথা আমরা পরে বলবো।

এইবার রাজলক্ষ্মী নিঃশেষে শ্রীকান্তের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। যে শ্রীকান্ত একদিন রাজলক্ষ্মীকে বলেছিল—'লক্ষ্মী !

আমি তোমার জন্য সব ত্যাগ করতে পারি, কেবল পারি না আত্মসম্মান।' আজ সেই শ্রীকান্তের আত্মসম্মান কোথায় রইল এই নারীর একনিষ্ঠ প্রেমের আত্মসমর্পণের কাছে? শ্রীকান্তকে স্বামী ভাবে পেয়ে রাজলক্ষ্মী বলছে—'বাড়ী এসে আহ্নিকে বসলুম। দেখতে পেলুম, তুমি কেবল একাই ফিরে আসনি—সঙ্গে ফিরে এসেছে আমার পূজার মন্ত্র....এসেছেন আমার ইষ্টদেবতা গুরুদেব...এসেছে আমার শ্রাবণের মেঘ। আজও চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। কিন্তু সে আমার রক্ত-নেঙড়ানো অশ্রু নয়, আমার আনন্দের উপচে ওঠা ঝরণার ধারা—আমার সকল দিক ভিজিয়ে দিয়ে, ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে গেল।'

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই রাজলক্ষ্মী কে? তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী—লক্ষ্মী বলেই যাকে তিনি আদর করে ডাকতেন। একদিনের ছোট একটি ঘটনা হতে এই সত্য সেদিন আমি আবিষ্কার করি। সেদিন যদিও শ্রাবণের মেঘ আমার চোখের কোণে সজল কাজল পরায় নি, তবুও সেদিনকার সমস্ত আকাশ বসন্তের রামধনুর রঙে আমার চোখে বর্ণের সুষমায় ছেয়ে গিয়েছিল—আর শ্রদ্ধায় মাথা অমনি নুয়ে পড়েছিল এই আশ্চর্য্য শিল্পীর পায়ে—যিনি জীবনের প্রতি রস অণু-পরমাণু দিয়ে নিঙড়ে নিঙড়ে অমৃতের সন্ধান পেয়েছিলেন ও সেই অমৃত রস আস্বাদ করে নিজেও মৃত্যু জয় করেছিলেন, আর সকলকেও অমৃতের সন্ধান দিয়ে গেছেন। উপনিষদের ভাষায়—সেই আশ্চর্য্য কুশলী বক্তা অমৃতের পুত্র ছাড়া এ-অমৃত রসের সন্ধান কেউ পায় না।

'পথের দাবী' লেখা চলছিল বাজে শিবপুরের বাড়িতে। পাণ্ডুলিপি থাকতো তাঁর হাত টেবিলের উপরেই। সেই পাণ্ডুলিপি পড়বার অধিকার তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। তখন আমাদের দুশ্চিন্তায় ঘুম হতো না—ভারতীকে তিনি কি করবেন ? অপূর্ব্বর সাথে বিয়ে দেবেন কিনা ? এই জন্যই পথের দাবীর পাণ্ডুলিপির প্রতি ঝোঁক ছিল—তা না হলে সব্যসাচীর কি পরিণাম হবে, তা' নিয়ে আমরা মাথা ঘামাতাম না—সে বিষয়ে আমরা একরূপ নিশ্চিন্ত ছিলুম। সব্যসাচীর একটা কিছু হবেই—হয় ফাঁসী, না হয় সে পালিয়ে যাবে।

এই রকম একদিন পথের দাবীর পাণ্ডুলিপির পাতা ওলটাতে ওলটাতে দেখি, ইংরেজীতে যাকে বলে, scribbling··· হিজিবিজি কাটা, তবে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা—"রাজলক্ষ্মী যদি ছাড়িয়া যায়, তবে জীবনের রহিল কি ?"

আর যায় কোথা ? আমার মনে হলো—Eureka ! পেয়েছি ! পেয়েছি ! অমৃত রসের সন্ধান পেয়েছি। দাদাকে দেখাতেই তিনি রেগে—অবিশ্যি কৃত্রিম রাগ—আমার হাত থেকে টান দিয়ে পাণ্ডুলিপি কেড়ে নিলেন ও কড়া হুকুমে আদেশ দিলেন—তুমি আর পাণ্ডুলিপি পড়তে পাবে না। হলোই তাই। তারপর থেকে তিনি পাণ্ডুলিপি দেরাজে বন্ধ করে রাখতেন। তিনি তাকে বিয়ে করেছিলেন শৈব-মতে। যেদিন সেই কথা তাঁর মুখে শুনলুম, আমার সব অমৃতের সন্ধান বিষিয়ে গেল। নিজের অলক্ষ্যে চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে ক' ফোঁটা

জল ঝরে পড়লো। আমি স্পষ্টই বললুম—এত বড় ভালবাসাকে আপনি বিয়ে করে অমর্য্যাদা করলেন? যেটা ছিল স্রোতের জল, স্বচ্ছ পুণ্যতোয়া, ভাগীরথী—আজ সেটাকে বাঁধ দিয়ে করলেন একটা পুকুর, খানা, ডোবা! তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—এ ছাড়া উপায় ছিল না···তাছাড়া ও ছাড়লোও না।

এতদিনে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। তখন বুঝিনি। না জেনে দাদার মনে আমি কী আঘাতই না দিয়েছি! এখন বুঝেছি, রাজলক্ষ্মী স্বামী চেয়েছিল—সে প্রেমিক চায় নি। গৌরীর মত তপস্যা করেই সে এই ভবঘুরে স্বামী লাভ করে-ছিল। রাজলক্ষ্মীর জীবনের পূর্ণতা···স্বামী-স্ত্রীর প্রেম—এ-অমৃত সকলের ভাগ্যে জোটে না।

এই শ্রীকান্তকে নিয়ে মাঝখানে গুজব উঠলো—দাদা নোবেল প্রাইজ পাবার জন্য ক্ষেপে গেছেন ও সেজন্য দস্তুরমত তদ্বির শুরু করেছেন। তাঁর অনেক বই-ই অন্য ভাষায় তর্জমা হয়েছে—হিন্দী, গুজরাটী ইত্যাদি। এখানি তর্জমা করবার জন্য তিনি নাকি ডাঃ কানাই গাঙ্গুলীকে ভার দিয়েছেন। তখনও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ লাগেনি। ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী বিদ্বান, সুপুরুষ—চেহারা এত সুন্দর যে প্রথম দেখায় নেতাজী বলে ভ্রম হয়—সেই প্রশস্ত কপাল, মাথায় টাক, উন্নত নাসা, দুধে-আলতা গায়ের রং। এতো গেল তাঁর বাইরের কথা। তাঁর ভেতরের কথা—তিনি বিপ্লবী। তিনি জার্ম্মাণী হতে বিস্ফোরক পদার্থ-বিদ্যায় (Explosives) অনুশীলন করে ডক্টরেট

উপাধি লাভ করেছেন। এই বিস্ফোরক সম্বন্ধে জ্ঞান ভারতে খুব কম লোকেরই আছে—অর্থাৎ explosives অনুশীলনের ডক্টরেট বোধ হয় আর কেউ নেই। এর উপর তিনি ছিলেন হিট্‌লারের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। মিউনিক বিপ্লবের সময় ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী জার্ম্মাণীতে ছিলেন একটানা সাত-আট বৎসর। তাঁর কাছে হিট্‌লারের নিজ হাতে লেখা বহু চিঠি দেখেছি। তিনি আমাদের অনুরোধে সেগুলো মাঝে মাঝে তর্জমা করে শোনাতেন—আর তাঁর কাছে হিট্‌লারের গল্প শুনতুম। তাঁর সাথে হিট্‌লার চক্রের অন্য রথীগণেরও আলাপ ছিল। তাঁকেই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথমে জার্ম্মাণীতে মেশিনগান ও অন্যান্য মানুষ-মারা যান্ত্রিক কলকব্জার ব্যবহার শিখতে দেওয়া হয় হাতে-কলমে। তা ছাড়া ডাঃ কানাই গাঙ্গুলী বহু ভাষা জানতেন; জার্ম্মাণ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান ইত্যাদি। তিনি শ্রীকান্তের ইটালী ভাষায় (Italian) তর্জমা করেন। এই ডক্টর কানাই গাঙ্গুলীকে মুরুব্বি ধরে, তাঁকে নাকি খরচ পত্র দিয়ে দাদা জার্ম্মাণী পাঠিয়েছেন—হিট্‌লারকে দিয়ে তদ্বির করিয়ে যাতে নোবেল প্রাইজ পান এই জন্যে।

শ্রীকান্তের চেয়ে দরে অনেক ছোট বই অবিশ্যি নোবেল প্রাইজ পেয়েছে। শ্রীকান্ত নোবেল প্রাইজ পেলে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু ঘটনাটা জানি কি করে? আমি তখন বাঙলা ছেড়ে দূরে—কাশীতে। ১৯৪০-৪১ সালে কাশীতে ডক্টরের সাথে হঠাৎ আমার দেখা। আমি ডক্টর গাঙ্গুলীকে

এই কথা জিজ্ঞাসা করি। তিনি বললেন—জার্ম্মাণীতে তিনি নিজেই গিয়েছিলেন এবং জার্ম্মাণ ভাষায় শ্রীকান্ত অনুবাদও করেছিলেন। কিন্তু অনুবাদে মূল বইয়ের ভাব রক্ষা করা যায় নি বলে সে-অনুবাদ প্রকাশিত হয়নি। তাঁরই কাছে শুনলুম, শ্রীকান্তের ইটালিয়ান অনুবাদ তিনিই করেছিলেন ও ইটালীতে চলছে।

এ হেন গুণী লোক তখনকার দিনে ব্রিটিশ রাজত্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্ম্মাণ ভাষার অধ্যাপনা করতেন—তাঁর বিস্ফোরক পদার্থ-বিদ্যার জ্ঞানের জন্য তাঁকে পুলিসের জুলুম কম সইতে হয়নি। ডক্টর কানাই গাঙ্গুলী দাদার অকৃত্রিম সুহৃদ ও অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন।

কমললতা

এই ভবঘুরে ছন্নছাড়া জীবনের শেষ সময়ে অপ্রত্যাশিত ভাবে জুটে গেল শ্রীকান্তের জীবনে কমললতার দেখা। কমললতার সাথে শ্রীকান্তের প্রথম সাক্ষাৎ মুরারিপুরের আখড়ায়। শ্রীকান্তকে তার সন্ধান দিয়েছিল নবীন—তার বাল্যকালের বন্ধু কবি-দরদী গহরের ভৃত্য নবীন। নবীন শ্রীকান্তকে সাবধান করে দিয়েছিল—কমল দেখতে ভাল—ভাল গান করে। তার প্রভুকে সে গুণ করেছে—তিনি আখড়ার জন্য টাকা খরচ করছেন অকাতরে। তার অসাধ্য কিছু নেই। সাবধানে যাবেন, যেন কমললতার ফাঁদে পা না দেন। এই নেড়ানেড়িদের ব্যবসাই হচ্ছে লোক ঠকিয়ে পয়সা নেওয়া!

এই কমললতা কে ?

তার অতীত জীবনের কথা শ্রীকান্তের সাথে একদিনের পরিচয়ে সে অকুণ্ঠে বলেছিল যে বিধবা হয়ে সে সন্তানবতী হয়—সে তার বাপের গদীর এক কর্ম্মচারীকেই তার অনাগত সন্তানের পিতা বলে স্বীকার করায়।

তার বাপের টাকা ছিল। দশ হাজার টাকা দিয়ে এই নারীর অনাগত সন্তানের পিতৃত্বের পরিচয় দিতে তার বাবা ঐ লোকটিকে স্বীকার করায় ও তাদের কণ্ঠিবদল করে বিয়ে দেয়। কিন্তু এই লোকটি কণ্ঠিবদলের সময়ে মোচড় দিয়ে আরো দশ-হাজার টাকা আদায় করলে এই বলে যে, অন্যের সন্তানের পিতা হওয়া সহজ কথা নয়। কমললতার এ-সন্তানের পিতা হচ্ছে তার ভাইপো যতীন। এই যতীনকে কমললতা আপনার ভাইয়ের মত ভালবাসতো। যতীন আত্মহত্যা করে এই নিদারুণ মিথ্যা কলঙ্ক ও অপমানের হাত থেকে বাঁচল। সে একদিন কমললতাকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করেছিল—আজ সে নিজে মরে কমললতার সব গ্লানি মুছে দিয়ে গেল। কমললতার বুকে যতীনের এইভাবে মৃত্যু খুব বাজে। যেজন্য এত তোড়জোড়—তার হলো এক মৃত সন্তান। সে এই গ্লানিকর কণ্ঠিবদল বিয়ে থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে গেল; এই পশুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সে চলে গেল বৃন্দাবন। সেখান থেকে দ্বারিকাদাস তাকে নিয়ে আসে মুরারিপুরের আখড়ায়। এই তার অতীতের লাঞ্ছিত

জীবনের ইতিহাস। সে শ্রীকান্তকে প্রথম দেখেই ভালবেসেছিল ও গহরের মুখে তার বন্ধুর “শ্রীকান্ত” নাম শুনে সে আঁৎকে উঠেছিল। তার মৃত স্বামীর নাম ছিল শ্রীকান্ত। তাই সে শ্রীকান্তকে বলছে—ও-নাম আমার মুখে আনতে নেই।

শ্রীকান্ত তার অনুভূতি দিয়ে কমললতাকে দেখে যে ভাবে, নিজের মুখেই সে-কথা সে বলে গেছে—“ওর জীবনটা যেন প্রাচীন কবি-চিত্তের অশ্রু-জলের গান। ওর ছন্দের মিল নেই, ব্যাকরণে ভুল আছে, ভাষার ক্রটী অনেক, কিন্তু ওর বিচার তো সেদিক দিয়ে নয়। ও যেন তাদের দেওয়া কীর্ত্তনের সুর—মর্ম্মে যার পশে, সেই শুধু তার খবর পায়। ও যেন গোধূলি আকাশে লাল রক্তের ছবি। ওর নাম নেই, সংজ্ঞা নেই—কলা-শাস্ত্রের সূত্র মিলিয়ে ওর পরিচয় দিতে যাওয়া বিড়ম্বনা।”

পরে শিল্পী তার সম্বন্ধে বলছেন—“সকলের আড়ালে থাকিয়া মঠের সমস্ত গুরুভারই কমললতা একাকী বহন করে। তাহার কর্ত্তৃত্ব সকল ব্যবস্থায় সকলের পরেই। কিন্তু স্নেহে, সৌজন্যে ও সর্ব্বোপরি কর্ম্মকুশলতায় এই কর্ত্তৃত্ব এমন সহজ শৃঙ্খলায় প্রবহমান যে, কোথাও ঈর্ষা-বিদ্বেষের এতটুকু আবর্জ্জনা জমিতে পায় না।” শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট নারী-চরিত্রের ভিতর কমললতাকে নারীর এক নতুন রূপে আমরা দেখি। আমরা দেখি, সংসারে এদের অবলম্বন করবার মত কিছুই নেই। এরা নিঃশেষে জীবনের যত গ্লানি, যত নিন্দা নীরবে

হজম করে পা বাড়িয়েছে, তাদের স্নেহ-মমতা উজার ক'রে অন্যের সেবায় ও পরিচর্য্যায়। জীবনের প্রশ্নে এদের স্থান অনেক উচ্চে। কল্পনায় এরা নিজেকে ভগবানের চরণে আত্ম-নিবেদন করে—দাসীভাবে তাঁর ভজনা করছে জনসেবার মধ্যে দিয়ে। এরা রক্ত-মাংসে গড়া, এদের অনুভূতি অতি চেতনশীল, এরা ভালবাসতে জানে, কিন্তু কোন প্রতিদান চায় না। আপন চলার পথে এরা যাকে পায়, তাকে নিজের সাথে জড়ায়—অন্যের গতি-পথে দলিত ও মথিত হয়ে যায় নিঃশেষে, তবুও এদের প্রাণের সঞ্জীবনী রসে তাদের অভিষিক্ত করে, নিজেকে নিঃশেষে দান করে, বাস্তব জীবনে ঘা খায়। শ্রীকান্তকে সে ভালবেসেছিল। বেশ সহজ করেই সে শ্রীকান্তকে বললে—'সবে কাল সন্ধ্যায় তো তুমি এসেছ, কিন্তু আজ আমার চেয়ে বেশী সংসারে তোমাকে কেউ ভালবাসে না।' শ্রীকান্ত সেদিন মনে করেছিলো—তার নামের সাথে তার মৃত স্বামীর মিলটাই এই বিপত্তির কারণ। পরে শ্রীকান্ত তার ভুল বুঝেছিল ও শ্রীকান্ত নিজেই কমললতাকে ভালবেসেছিল।

পুঁটুর বিয়ের দেরি আছে। গহরের বাড়ি গিয়ে, নবীনের কাছে এই আখড়ার কথা শুনে ভবঘুরের অনিশ্চিত যাত্রা-পথে নতুন বিস্ময় এলো—কমললতা, বৈষ্ণবের আখড়া ও তার অধ্যক্ষ দ্বারিকাদাস বাবাজী। কমললতা জীবনে ঘা খেয়ে আশ্রয় নিয়েছিল সেবাব্রতে। তার যত কামনা-বাসনা সে তুলে দিয়েছিল বৈষ্ণবের কল্পনার প্রেমের ঠাকুর বিগ্রহ-

মূর্তির হাতে—যাকে তারা জীবন্ত বলেই জানতো। এ-প্রেমে প্রতিদান চাওয়া নেই বা চায় না। কেবলি ভালবাসা—নিজেকে নিঃশেষ করে কল্পনার এই প্রেমে নিজেকে ভুলেছিল মীরাবাই ও আরও অনেকে। কিন্তু বাস্তবকে ঠেকান দায়। কবি ও ফকির গহর কমললতাকে ভালবেসে ফেললো। কমললতাও বুঝলো,—দ্বারিকাদাস বাবাজীও বুঝলেন। কমললতা দেখলো, এখানে আর নয়—পালাতে হবে। তার মন দুর্ব্বল। তাছাড়া গহরের অত বড় আত্মদান সে ঠেকাবেই বা কি করে? শ্রীকান্তের সাথে সে পালাতে চাইলো তার কল্পনার বৃন্দাবনে—সেটা হলো না। গহরও নিজে বুঝছিল যে, যাকে সে মনে-প্রাণে ভালবাসে, তাকে সে পেতে পারে না, হয়তো বা পেতেও সে চায় না তাকে। সে কবি—তার উপর সে ভাবুক। সে নিজেই সরে পড়লো এই খবর পেয়ে যে, তার বোনের বাড়ির দেশে কী এক নতুন আমদানী মহামারীতে দেশ উজাড় হয়ে যাচ্ছে। তাদের সেবা করতে চললো।

শ্রীকান্তের জীবনের মাত্র দশদিন; এই দশদিনেই তার গোটা অতীত জীবন তোলপাড় করে দিলো কমললতা। সে ছুটে পালালো রাজলক্ষ্মীর আশ্রয়ে। রাজলক্ষ্মী বুদ্ধিমতী। সে আর কাল বিলম্ব না করে নিজেই এলো কমললতার কাছে। রাজলক্ষ্মীর কথা কমল শুনেছিল। শ্রীকান্ত নিজ মুখেই তাদের দু'জনের কথা বলেছে—"দিশাহারা মন সান্ত্বনার আশায় রাজলক্ষ্মীর দিকে ফিরিয়া চায়। আর অন্য দিকে

দেখি, সকলের শুভ চিন্তায় অবিশ্রাম কর্ম্মে নিযুক্ত কল্যাণ যেন দুই হাতের দশ আঙুল দিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে।" রাজ-লক্ষ্মীর জীবনে এর অভাব ছিল; এই জন্য সে শ্রীকান্তকে পেয়েও তার হারাই-হারাই ভাব ঘোচাতে পারে নি। রাজলক্ষ্মীও এবার তার ভুল বুঝলো ও নিজে সে কমললতার ছোট বোন হয়ে, শ্রীকান্তকে কমললতার কাছ থেকে তার অপার স্নেহ ও করুণার দান আশীর্ব্বাদ বলে যেচে নিল।

এই কথাই শিল্পী চন্দ্রমুখীর মুখ দিয়ে একদিন বলেছিলেন—"শুধু অন্তরে ভালবেসেও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি যে টের পায়, সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ, অশান্তি আনতে চায় না।"

শ্রীকান্ত কমললতা সম্বন্ধে নিজেই বলছে—"ওর কাছে আছে আমার মুক্তি, আছে আমার মর্য্যাদা, আছে আমার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ।"

শ্রীকান্ত সাঁইতিয়া ষ্টেশনে নেমে কমললতাকে বিদায় দিয়ে প্লাটফর্ম্মে কেরোসিনের ল্যাম্প-পোষ্টের অস্পষ্ট আলোছায়ার আবছায়াতে জানলার ধারে বসে রিক্তা নারীর বিদায়-বেলার চোখের জল দেখতে পায় নি—তবে রেলের চাকার বিচিত্র ঘর্ঘর শব্দে শুনতে পেলো তার বুক-ফাটা চাপা কান্নার প্রতিধ্বনি, তার নিজের বুকে হৃৎপিণ্ডের রক্ত চলাচলের স্পন্দনে। আজ ভবঘুরে শ্রীকান্তের চলার পথ শেষ হলো—শুরু হলো, আর একটি ভবঘুরে নারীর অনিশ্চিত পথে যাত্রা—সে-পথ আর কোন দিনও শেষ হবে না। এই ভবঘুরে তিনি নিজে।

আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যেও এরকম বই খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। মানবের জয়যাত্রার অভিযানে হয়তো সেটা ব্যর্থতার করুণ কাহিনী, তবুও চলা—যার পদে পদে বিস্ময় ওত পেতে বসে আছে, যার গতি অব্যাহত, হয়তো-বা কখনও মন্থর শ্লথ, তবু সে চলেছে এগিয়ে। এইটেই জীবন প্রশ্ন—সর্ব্বকালে ও সকলের। নয় কি? শিল্পী তা দেখিয়েছেন।

রাজনীতিতে শরৎচন্দ্র

তাঁর রাজনীতির সংস্রবের কথা বলতে গেলেই, বলতে হয় তাঁর দেশবন্ধুর সাথে সংস্রবের কথা। সাল মনে নেই, সেটা হচ্ছে দেশবন্ধুর 'নারায়ণ' কাগজের যুগ; তখন তিনি দেশবন্ধু হন নি, ব্যারিষ্টার চিত্তরঞ্জন। বাপের দেনা ঘাড়ে নিয়ে তিনি দেউলে বলে নাম লেখান, পরে যখন অজস্র টাকা রোজগার করতে লাগলেন, আদালতে দরখাস্ত দিয়ে সব দেনার পাই-পয়সা শোধ করে দিলেন। 'নারায়ণ' যুগের একটু ইতিহাস আছে। চিত্তরঞ্জন কবি—তিনি সাগর-সঙ্গীত লিখেছেন—তিনি বৈষ্ণব পদাবলী লিখেছেন—তিনি ভাবুক, তিনি প্রেমিক, তিনি দরদী। তাঁর 'নারায়ণ'কে উপলক্ষ্য করে দুটো দল হয়ে গেল এই সময়ে। দলের লোকেরা যা' চিরদিন করে এসেছে—কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা বিবাদ বাধিয়ে তুললে তাঁর। দলের কাজ দল করল, কিন্তু সাহিত্যে তাঁর অপূর্ব্ব ছাপ রয়ে গেল। ওপক্ষ থেকে শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

আঁকতেন কার্টুন-নক্সা—এদিক থেকেও কবিতা, ছবি, গল্প··· সাহিত্যে সে এক সমারোহ ব্যাপার! অথচ কোন পক্ষ থেকেই শ্লীলতা বা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করতো না।

এই সময় চিত্তরঞ্জন শরৎদাকে ডেকে নিয়ে বললেন—আপনাকে 'নারায়ণে' লিখতে হবে। এই কথা বলে তাঁর সামনে একখানি খোলা চেক-বই রেখে বললেন—"আপনার যে অঙ্ক ইচ্ছে হয় বসিয়ে নিন।"

শরৎদা আর করেন কি? এক হাজার টাকা চেকে বসিয়ে দিলেন। তাই দেখে চিত্তরঞ্জন হেসে বললেন—"মাত্র হাজার টাকা!" দেশবন্ধু শিল্পী ও লেখকের মর্য্যাদা এই ভাবে দিতেন। এই গেল তাঁর দেশবন্ধুর সাথে সাহিত্য-সেবার ইতিহাস। তিনি নারায়ণে যে সব প্রবন্ধ বা গল্প লিখেছিলেন, সেগুলোর কথা আমার মনে নেই। কিন্তু একথা আমি জানি, সেগুলো আর সংগ্রহ করা হয় নি। সেগুলো সংগ্রহ থাকলে সাহিত্যে অমূল্য সম্পদ হতো।

১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলে, শরৎদা কংগ্রেসে যোগ দিলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির তিনি সভাপতি হলেন ও কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে তিনি সারা হাওড়া জেলা ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। শরৎদা চরকায় সূতো কাটতে লাগলেন ও চরকা বিলোতে লাগলেন। নাওয়া-খাওয়ার সময়ের ঠিক কোন দিনই তাঁর ছিল না; এইবার কংগ্রেসের কাজে যোগ দিয়ে, তিনি অনিয়মের আস্ত ডিপো

হয়ে উঠলেন। দুপুরের খাওয়া হতো তাঁর রাতে—কোন দিন খাওয়াই হতো না। কংগ্রেসের কাজ সমানে চালাচ্ছেন তিনি। এইভাবে বছর তিনেক গেল—তাঁর একদিকে দেশবন্ধু, অন্যদিকে সুভাষবাবু—আর তাঁকে ঘিরে অসংখ্য কংগ্রেস কর্ম্মীর দল। দাদা এখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত রাষ্ট্রিয়-সমিতির সভ্য। এইভাবে তাঁর দিন-রাত যায়। যে লোক ছিল কুনো লাজুক, তিনি হয়ে উঠলেন মুখর ও সর্ব্বসাধারণের।

এলো সিরাজগঞ্জ কনফারেন্স। দাদাকে যেতেই হবে—দেশবন্ধু তাঁকে ধরে বসলেন। কী আর করেন—তিনি চললেন। দেশবন্ধু চলেছেন তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে—সুভাষবাবু বোধ হয় যান নি। সালটি ১৯২২-২৩ হবে, জ্যৈষ্ঠ মাস—দাদা দিলীপকে সঙ্গে নিলেন। দারুণ গরম—দাদা দিনের মধ্যে তিনবার স্নান করছেন। তাঁর জন্য দেশবন্ধু বিশেষ বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন, তাঁকে সিরাজগঞ্জের কোন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়িতে রেখে—দাদা সে-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। সকলের সঙ্গে সাধারণ হয়ে থাকবেন।

ওখানকার কোন বড় ধনী মহাজন এসে প্রস্তাব করলেন দেশবন্ধুর কাছে, তাঁর বাড়ি ভাত না খেলে—অবশ্যি বামুন হওয়া চাই—অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জন মিথ্যে। এই ধনী মহাজন দেশবন্ধুর ও আমাদের এক বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধুর আত্মীয়। তাঁরা জাতিতে জলসচল নন।

দেশবন্ধু আমাদের তিন বামুনকে—দাদা, দিলীপ ও আমি—একেবারে রাঢ়ি-বারেন্দ্র সমাজের, কি বলবো—সেরা তিনজন প্রতিনিধি করলেন। আমাদের খাবার নেমন্তন্ন তাঁর বাড়িতে। তিনি তো পোলাও, মাংস ও যতরকম ভাল ভাল খাবার হতে পারে, তার জোগাড় করতে চাইলেন। আমরা বললুম, তা' হবে না। যা' আপনারা রোজ খান, আপনাদের মেয়েরা সেইটে রাঁধবেন, আমরা খাবো আপনাদের সাথে বসে। হলোও তাই; আমরা তিনজন বামুন খেলুম। আমি ছাড়বার পাত্র নই—খেয়ে বামুনের ভোজন-দক্ষিণা, যেটা আমাদের জন্মগত অধিকার আদায় করে নিলুম তাঁর কাছ থেকে নগদ পাঁচশত টাকা—সেটা তিনি দিলেন কংগ্রেস-ফণ্ডে অস্পৃশ্যতা নিবারণের জন্য।

কিন্তু গরমে দাদা থাকতে পারলেন না—সেইদিন রাতেই দিলীপকে নিয়ে কলকাতায় এলেন।

সুভাষবাবু জেদ ধরলেন—দাদাকে জেলে যেতেই হবে। দাদা মুখে বলতেন—তিনি সব সময়েই প্রস্তুত। অবিশ্যি অপ্রস্তুত তিনি কোন সময় ছিলেন না—তবে জেলে যেতে তিনি অন্য ভয় করতেন না, করতেন তাঁর মৌতাতের কী হবে! সুভাষবাবু বলতেন—সেটা তিনি যোগাড় করে দেবেন। দাদা বলতেন—তুমি যে আমার সাথে সব সময়েই জেলে থাকবে, তাতো হতে পারে না। তুমি বেরিয়ে এলে কী হবে?

সুভাষবাবু বললেন—প্রথমবার জেলে গিয়ে কামাবার ব্লেডের অভাবে আমার কামান হতো না। জেলে ব্লেড নিষিদ্ধ।

তিনি বললেন—শেষে আর কি করি, পরের বার জেলে গেলে আমি জুতার সুকতলার ভেতর ব্লেড পুরে নিয়ে যাই। আপনিও তাই করুন। চললো দাদার এক্সপেরিমেণ্ট—কী করে জুতোর সুকতলাতে আফিঙ নেওয়া যায়। শেষে এ-ব্যবস্থাও দাদার মনে লাগলো না। তাঁর জেলে যাওয়াও আর সেইজন্য হলো না। এই রকম হৃদ্যতা দাদার ছিল দেশবন্ধু ও সুভাষবাবুর সাথে।

বছর চারেক এই ভাবে কেটে গেছে, দাদার কংগ্রেসের কাজে। দেশের কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে সুভাষবাবু দু'বার জেলে গেছেন—দেশবন্ধু একবার।

এই সময়ে অহিংস বিপ্লববাদীদের দেখি আর এক রূপান্তর। কোল্টের রিভলভার দেখিয়ে দাদা বললেন—ছাখো, রিভলভারের নামে বাঙালীর মোহ আছে—তার ওপর কোল্ট। তারো ওপরে রিভলভারটি সত্যই সুদৃশ্য—হাতের বিঘতের মধ্যে লুকোন যায়।

আমরা তো ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখি। দাদা বলেন—দেখছ কী? পাশ নেই—চোরাই মাল! একে অহিংস, সূতোকাটা কংগ্রেসী, জেলার কংগ্রেস কমিটীর প্রেসিডেণ্ট—তাঁর হাতে কোল্ট রিভলভার, আবার বলে কিনা চোরাই মাল!

এরপর দাদার পোষাকের ভোল বদলে গেল। তিনি পাঞ্জাবী ছেড়ে ধরলেন গলাবন্ধ চীনে-কোট—তার চোরাই পকেটে থাকতো এই কোল্ট। আমাদের সাথে পথে-ঘাটে দেখা হলে, বাঁ হাতটি বুক পকেটে ঠেকাতেন। তাতে বোঝা যেতো,

সেটি সঙ্গেই আছে। জিজ্ঞাসা করলে বলতেন—ভেলু নেই, (তখন ভেলু মরেছে) চোর-ডাকাতের হাতে কখন কী হয় বলা যায় না তো।

বছর চারেক পর দাদা হাওড়া কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টের কাজে ইস্তফা দিলেন। তাঁর প্রেসিডেণ্ট থাকার সময় হাওড়া মাজু গ্রামে কনফারেন্স হয়। আরো অনেক কনফারেন্সে হাওড়া জেলায় তাঁর সাথে যাবার আমার সুযোগ হয়েছিল। এই সব কংগ্রেস কনফারেন্সের সংস্রবে তাঁর যে সামাজিক জীবন চোখে পড়তো, সেটা তাঁর অমায়িকতা, সহজ সরল ব্যবহার ও সকলের সাথে হৃদ্যতা। হাওড়া কংগ্রেসের কাজ ছেড়ে দেবার পর আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম—এইবার দাদাকে পাওয়া যাবে। এই সময় তিনি 'পথের দাবী' লিখতে লাগলেন। যদিও প্রকাশ্য ভাবে কংগ্রেসের কাজ ছেড়ে দিলেন, তবুও যতদিন দেশবন্ধু ছিলেন ও সুভাষবাবু বাইরে থাকতেন, সকল কাজেই দাদার মতামত জানতেন। অনেক বিষয়ে তিনি ছিলেন রাজনীতি-ক্ষেত্রে MAN-BEHIND.

পথের দাবী

কাহিনী খুব সোজা—বিচিত্র নয়, তবে তার করাল-রূপ, যা' দেখে মানব-সভ্যতার গোড়া থেকে আজ পর্য্যন্ত এই অপরাজেয় মানবকে তাঁর জয়যাত্রার পথে যারা নানাভাবে বাধা দিয়েছে

যা দিচ্ছে, তারা যতই শক্তিমান হোক না কেন, ভয়ে আঁৎকে উঠেছে ও চিরদিনই আঁৎকে উঠবে। এক অজ্ঞাত বীর সাহসী যুবকের ভাই এই সব্যসাচী....যিনি গল্পের নায়ক। গ্রামে ডাকাত পড়ে—ডাকাতরা গ্রামের মোহান্তকে পুড়িয়ে মারে। এই নির্ভীক যুবক একাই তাদের সামনে এগিয়ে যায় তাদের ঠেকাতে। তার ডাকে গ্রামের লোক কেউ এলো না। ফলে ডাকাতরা চলে যায়—মন্দিরের ধন-সম্পত্তি আর লুঠ করতে পারে না। কিন্তু যাবার বেলা তারা শাসিয়ে যায়—"ঠাকুর, আমরা আবার আসবো। তোমাকে দেখে নেবো।"

তাদের কথা তারা রেখেছিল। এই বীর যুবক গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে বলে...নিজে হাতিয়ার সংগ্রহ করে...পুলিশকে খবর দেয়—কিন্তু কেউ তাকে সাহায্য করলো না। ডাকাতরা তাদের কথা রেখেছিল। বীর যুবক একাই গেল তাদের সাথে লড়তে। সে পালাতে জানে না। সে বীরের মতই প্রাণ দেয়—মরবার আগে তার ছোট ভাইকে দিয়ে যায় এই অগ্নিমন্ত্র—মানবের চলার পথে যারা বাধা দিচ্ছে, সেই অত্যাচারী শোষক বণিক সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস করিস। এদের চাইতে মানবের বড় শত্রু আর নেই। সেই বীর বালক তার শহীদ ভ্রাতার মৃতদেহ স্পর্শ করে এই প্রতিজ্ঞা করে—মানুষের সর্ববিধ দাবী স্বীকার করবার পথ আমি তৈরী করবো। আর সেই পথে যারা বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ধ্বংস করবো। এগিয়ে চলে সেই বীর বালক একাকী—সঙ্গীহীন

পথের নেশায়—পথের ডাকে। এই বীর বালকের মানবের চলার পথে বাধা....মানবের জয়যাত্রার পথে পরম শত্রু ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা—আমাদের মনে করিয়ে দেয় এই যুগেরই শিল্পীর সমসাময়িক আর এক বীর বালকের কথা—লেনিন। সে-ও তার বীর ভ্রাতার শোচনীয় মৃত্যু দেখে রুশ সাম্রাজ্য ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা করেছিল—সে তা' করেও ছিল। পথের দাবী এগিয়ে চল্‌লো। সব্যসাচীর প্রতিজ্ঞা.... মানুষের সর্ব্বপ্রকার দাবী স্বীকারের ডাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-বাদের উৎপীড়িত মানব-সমাজ সাড়া দিল—দেশে ও বিদেশে; বিদেশে বৃহত্তর দ্বীপময় ভারতে স্থাপিত হলো তার কেন্দ্র—যাভা, সুমাত্রা, সুরাভয়, টৌকিও, চীন, শ্যাম ও জাপানে।

শিল্পী এক অবচেতন যুগধর্ম্মকে এই বইয়ে বাস্তবের আভাসে চেতনা-মুখর করেছেন তাঁর অননুকরণীয় ভাষায়—যাকে বাস্তবে রূপ দিয়ে গেলেন তাঁর সহকর্ম্মী ও অকৃত্রিম সুহৃৎ নেতাজী....সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার উৎপীড়িত মানবের জয়যাত্রার অভিযানে....জগৎ হতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের প্রেরণায় আজাদ হিন্দ রাষ্ট্র গঠন করে।

জগতের ইতিহাসে অনাগত ঘটনার এরূপ বাস্তব রূপ সাহিত্যে আর নেই—আছে মাত্র একখানি বইতে (এইচ, জি, ওয়েলসের Shape of things to come) কিছু। সে বইখানিই একমাত্র পথের দাবীর পাশে দাঁড়াতে পারে এইজন্য যে, তাতে

ওয়েলস কেবল গত মহাযুদ্ধের আভাস দিয়েই ক্ষান্ত হন নি, তিনি বলেছেন যে, ইউরোপের এই যান্ত্রিক সভ্যতা একদিন ভেঙে পড়বে তার আপনার যন্ত্রদানবের চাপে। পড়েছেও তা—এটম শক্তির অপব্যবহার ও শ্বেত জাতির····বিশেষ করে কেলটিক জাতির····অন্য জাতির এগিয়ে চলার পথের গতিরোধ করা দেখে—যেটা সাম্রাজ্যবাদেরই রূপান্তর····ধনিক রাষ্ট্রতন্ত্রের অন্যরকম মুখোশ। গত মহাযুদ্ধও এইজন্যই, তাতেও মানুষের সর্ব্ববিধ দাবী স্বীকৃত হয় নি। ওয়েলসের কথা অর্দ্ধেক ফলেছে—বাকীটুকু এখনও ফলে নি, তবে ফলবে একদিন নিশ্চয়। পথের দাবীর মূলমন্ত্র হচ্ছে—মানব অপরাজেয়। মানুষের সর্ব্ববিধ দাবী স্বীকার করবার বোধ ও চেতনাই হচ্ছে এর প্রেরণা—তার অভিব্যক্তি সব্যসাচীর ব্যক্তিত্বে এবং সেই মানবের জয়যাত্রার অভিযান, যার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন নেতাজী।

পথের দাবীর মানুষের সর্ব্ববিধ দাবী স্বীকার—মানব সভ্যতার সর্ব্বকালের ও সকল দেশের বর্ত্তমান ও অনাগত মানবের মূলমন্ত্র চিরদিনই হয়ে থাকবে, মানব মন ও মানব সভ্যতার এই শাশ্বত সত্যকে শিল্পী রূপ দিয়েছেন। এখানে কেবল জীবনের প্রশ্ন নয়—সমগ্র মানব জাতির প্রশ্ন····মানুষের সর্ব্ববিধ অধিকার স্বীকার করা। এই প্রশ্ন শাশ্বত প্রশ্ন। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক সাহিত্যে এর আভাস আর কোথাও পাওয়া যায় না। এইজন্য আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যে পথের দাবীকে মহাকাব্য বা এপিক্ বলা চলে।

জীবনে ও মনে শিল্পী ছিলেন বিপ্লবী,—তিনি সব্যসাচী চরিত্রের আভাস কোথায় পেলেন ?

তাঁকে বলতে শুনেছি—যখন তিনি রেঙ্গুনে, তখন নলিনী গুপ্তের দেখা পান, যিনি অবনী মুখার্জ্জীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি আজন্ম বিপ্লবী। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র ও জগৎ হতে সাম্রাজ্যবাদের অবসান করাই ছিল তাঁর জীবনের মুলমন্ত্র—যিনি ব্রিটিশের চোখে ধুলো দিয়ে সিঙ্গাপুরের সমুদ্রের ফাঁড়ি সাঁতরে পার হন। পরে সাম্পানে করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ বর্ম্মায় পৌছেছিলেন ও সমগ্র পর্ব্বত অরণ্যময় ভীষণ বিপদ-সঙ্কুল উত্তর বর্ম্মা ভ্রমণ করেন এক হাতীর পিঠে। শেষে ঐ হাতীর পিঠেই সানষ্টেট হয়ে—চীন পাড়ি দিয়ে যান রুশিয়ায়, সমগ্র দক্ষিণ ও উত্তর এশিয়ায় বিপ্লব প্রচার করতে। তাঁকে ব্রিটিশ ধরতে পারে নি। এঁর আদর্শেই শিল্পী গড়েছিলেন সব্যসাচী—পরে নেতাজী হয়েছিলেন যাঁর বাস্তব রূপ।

পথের দাবীতে আমরা দেখতে পাই—কর্ত্তব্যনিষ্ঠার (Duty) প্রতীক টেলিগ্রাফের পিওন হিরাসিং। আন্তর্জ্জাতিক সাহিত্যে একমাত্র সার্জ্জেণ্ট জাভার্টের * সাথে যাঁর তুলনা চলে—যে জাভার্ট তাঁর কর্ত্তব্য করতে না পেরে....জীনভালজাঁকে বন্দী করতে তাঁর বিবেক চাইল না...সে সীন নদীতে ডুবে আত্মহত্যা করলো। অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে....ঘরে-বাইরে যেন প্রলয়ের ঝঞ্ঝা বয়ে যাচ্ছে—সব্যসাচী বিদায় নিচ্ছেন...বর্ম্মায় তাঁর কাজ শেষ হয়েছে।

* ভিকটোর হিউগোর লা মিজারেবল।

বিপ্লব প্রচেষ্টায় দেখা দিয়েছে ভাঙন—ব্যর্থতার প্রচ্ছন্ন-রূপে হীরাসিং দাঁড়িয়ে ঠায়ে ভিজছে তাঁর সন্ধানী কাজে সৈনিকের Sentry dutyতে—ডাক্তার তাঁর কীট ঘাড়ে করে সেই প্রলয় ঝঞ্ঝার মধ্যে চললেন—তাঁর মানবের সর্ব্ববিধ অধিকার স্বীকারের পথে একাই—যে পথের কোনদিন শেষ নেই।

অনাগত ঘটনাকে এমন বাস্তব রূপ দিতে সাহিত্যে আর কোন শিল্পীই পারেন নি। আমরা দেখতে পাই—১৯৪৫-এর এপ্রিলে নেতাজী বেতারে রেঙ্গুন হতে তাঁর বিদায় বাণী দিচ্ছেন এমনি দুর্দ্দিনে....তখন ব্রিটিশ সৈন্য রেঙ্গুনে প্রবেশ করেছে। তিনি বলছেন—বর্ম্মায় আমাদের কাজ শেষ হয়েছে। তবে এ-সংগ্রামের শেষ নেই—আমরা দক্ষিণ এশিয়া হতে....আমাদের সব বল একত্রিত করে ...ব্রিটিশকে আঘাত হানবো।

আরো দেখতে পাই, যখন ইম্‌ফাল হতে তাঁর দুর্ম্মদ রণ-ক্লান্ত সৈন্যেরা ফিরছে, উত্তর বর্ম্মায় কী দারুণ বৃষ্টি নেমেছে—তারি মধ্যে সব্যসাচীর মত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে তিনি নিজের কীট ঘাড়ে করে এসে আশ্রয় নিলেন টিমুতে—এক ভাঙা টিনের চালায়!

সুমিত্রা, ভারতী এঁদের রূপান্তর আমরা দেখতে পাই—মেজর লক্ষ্মী ও আজাদ হিন্দ ফৌজের অসংখ্য নারী-বাহিনী ইরা, সিপ্রা, রেবা প্রভৃতির মধ্যে। সুমিত্রাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে আজও মেজর লক্ষ্মীনাথনের মধ্যে—ভারতীর মত ইরা, সিপ্রা, রেবাদের দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না—যদিও তারা বেঁচে আছে নারীর চেতন ও অবচেতন মনে...মানুষের সর্ব্ববিধ দাবী

স্বীকারের মধ্যে···যে দাবীর প্রথম স্বীকার্য্য হচ্ছে নারীর স্বাতন্ত্র্য অধিকার পুরুষের অধীনতা হতে।

শিল্পীর এই কল্পনাকে যে এভাবে অক্ষরে অক্ষরে ভবিষ্যতে নেতাজী বাস্তবে রূপ দেবেন—কেউ ভাবতেও পারে নি।

এইখানে তিনি ঋষি, তাঁর দেখা কত সত্য! সত্যই তিনি অনাগত ঘটনাকে দেখতে পেয়েছিলেন; এমন দেখা আর কেউ দেখেনি। আমরা দেখতে পাই, সব্যসাচীরই মত—১৯৪৫-এর ১৮ই আগষ্ট ব্যাঙ্কক হতে নেতাজী প্লেনে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে—চলেছেন একা মানুষের সর্ব্ববিধ অধিকার স্বীকারের দাবী নিয়ে অনিশ্চিত যাত্রা-পথে···কেউ জানে না কোথায়?

এই শাশ্বত প্রশ্নেরও শেষ নেই—এ-পথেরও শেষ নেই! এ-পথের পথিক যাঁরা, তাঁরা পথের নেশাতেই চলছেন—পথ তাঁদের হাতছানি দিয়ে ডাকে—তাঁরা পেছনে ফিরে চান না! দৃষ্টি তাঁদের দূরে—মাটির সীমারেখা যেখানে আকাশ ছুঁয়েছে—কিন্তু যতই এগিয়ে যাওয়া যায়, তার নাগাল আর পাওয়া যায় না।

লাজুক শরৎচন্দ্র

দাদা যে কত বড় লাজুক ছিলেন তা এই দুটি ঘটনা থেকেই বোঝা যাবে। দাদাকে কলিকাতা ইউনিভারসিটি জগত্তারিণী মেডেল দেবেন। দাদা বেঁকে বসলেন, তিনি মেডেল নিতে যাবেন

না, যাঁদের দরকার বাড়িতে দিয়ে যাবেন। কনভোকেসনের দিন তিনি গিয়ে বন্ধুবর সুধীর সরকারের দোকানে (এম, সি, সরকার এণ্ড সন্‌স, পুস্তক-বিক্রেতা) জমে বসলেন—তিনি যাবেন না ইউনিভারসিটিতে। অনুনয়-বিনয়, সাধ্য-সাধনা চল্‌লো—শেষ পর্য্যন্ত তিনি রাজী হয়েছিলেন কি না আমার সঠিক মনে নেই, তবে বিকেলের দিকে সুধীর-বাবুর দোকানে অসম্ভব ভীড় হয়েছিল—দাদা সেখানে বসে আছেন—তাঁকে ঘিরে ভিড় সাহিত্যিক রথীদের। জগত্তারিণী মেডেল পাওয়ার সম্বর্দ্ধনা সুধীরবাবুর দোকানেই হলো!

এই রকম আর একটি ঘটনা মনে পড়ে—সেটি শরৎ সম্বর্দ্ধনা নিয়ে। এর উদ্যোক্তা দাদারই সকল ভক্তেরা—তবে ভার নিয়েছিলেন নির্ম্মলদা *। ঠিক হয়েছিল তাঁকে দেওয়া হবে দামী ফাউনটেনপেন ও একসেট রূপোর চা'এর সরঞ্জাম। দাদা বললেন—তিনি কিছুই চান না, তবে নেহাতই যদি সকলে উপহার নেবার জন্য জিদ করেন, তবে ফরসি হলেই ভাল হয়। নির্ম্মলদা বললেন—দুইই হবে। চা'এর সেটের সাথে রূপোর ফরসি, কলকে, তার ঢাকনি—নিয়মমাফিক সব হলো। সম্বর্দ্ধনাও হলো ভাল করে। কিন্তু এসবে তাঁর জীবনের যে সুপ্ত ব্যথা ছিল, সেটা গেল না!

দেশবাসী তাঁকে সম্মান ও মর্য্যাদা দিয়েছিল—তবে তাতে

* ৺নির্ম্মলচন্দ্র চন্দ্র।

তিনি অসন্তুষ্ট হন নি, তিনি খুশীই হয়েছিলেন…তবুও তাঁর মনে যেন কোথায় বাধতো। কীসের এ-ব্যথা ?

এটা কি তাঁর অভিমান ? না, নিজেকে জাহির না করবার ইচ্ছা ? বন্ধু মহলে তিনি ছিলেন প্রাণখোলা শিশুর মত সরল। এই সব ভিড়ের মধ্যে তিনি যেন হাঁপিয়ে উঠতেন—যেন কলের মানুষ, আগে হতে ঠিক করা বাঁধা বুলি আওড়াচ্ছেন মাইকের সামনে। তাঁর ভেতরের মানুষটি এ-সবে কোনদিন সাড়া দিতো না। বোধহয় তিনি ভাবতেন, তাঁকে বোঝাবার মত সময় এখনও হয়নি। এক সভায় তিনি বলেছিলেন—সেইদিন তাঁর জীবনের সুদিন আসবে, যেদিন বাঙালী তাঁকে ভুলে যাবে। অবিশ্যি তিনি তুলনা দিয়েছিলেন গোর্কীর সাথে—তাঁর তুলনায় তিনি কত ক্ষুদ্র, তাঁকে মনে করে রাখবার মত তিনি কিছুই করে যেতে পারেন নি ! এক একবার মনে হয়, কত বড় ক্ষোভে তিনি এই কথা বলেছিলেন। আবার মনে হয়, এটা তাঁর লাজুকতারই পরিচয়।

এই মুখ-চোরা মানুষটি নিজের কথা কোনদিন বলেন নি। ভারতের শিল্পীদের সনাতন পথ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। আজও তাজমহলে, মাদুরা, ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরে কোথাও শিল্পীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। শিল্পী তাঁর শিল্পের মধ্যে নিজেকে এমনি ভাবেই নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তিনি জানতেন, তাঁকে ভুলতে চাইলেও ভোলা সহজ নয়।

এটা তাঁর অবচেতন মনের কোন্ দিক ? এটাকে

inferiority complex বলা যেতে পারে না।—এক একবার মনে হয়, এটা superiority complex-এরই একটা দিক—সমাজের প্রতি, নিজের প্রতি দারুণ বিতৃষ্ণা ও দ্রোহ। তিনি যা চাচ্ছেন, তা' পাচ্ছেন না—পাননি আজীবন। এটা তারই অভিব্যক্তি বলে মনে হয়। অথচ তিনি সমাজের কোন স্তরের মানুষকে ও তার পরিবেশকে বিদ্রূপের চোখে দেখেন নি—দেখেছেন দরদ দিয়ে। নিজের প্রতি ছিল তাঁর অসাধারণ সংযম। এইখানে তাঁর এই লাজুকতার একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। রেঙ্গুন থেকে দাদা ফিরলেন—অবশ্য শ্রীকান্তের বেনামীতে। আউটরাম ঘাটে রাজলক্ষ্মী তাঁকে আনতে গেছেন। গাড়িতে উঠে চলেছেন তাঁরা। শ্রীকান্ত বলছেন—এতদিন পর দেখা হবার পরে মনের একটা গভীর ইচ্ছা কি কষ্টেই না দমন করেছিলাম। বহুদিন পর দেখা হলে যে-সম্ভাষণ জানানো…চিরাচরিত প্রথায় যাকে ভালবাসা যায় সেই সম্ভাষণ…দাদা জানাতে পারলেন না—মনের ব্যগ্র আগ্রহ থেকে গেল।

এটা তাঁর লাজুকতাই বলা চলে।

সাহিত্যে সুরুচি ও কুরুচি

তখনকার দিনে সাহিত্যে সুরুচি ও কুরুচি নিয়ে খুব লেখা-লেখি ও মাতামাতি চলত এবং সাহিত্যে কুরুচির প্রশ্রয় দিচ্ছেন

দাদা ও ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত—এই প্রচ্ছন্ন বিদ্বেষ ক্রমে প্রচ্ছন্নতা ছাপিয়ে, স্পষ্ট হয়েই দাদার বিরুদ্ধে অভিযোগের আকারে দেখা দিল।

একদিনের ঘটনা। সাহিত্যে সুরুচি দলের মুখপাত্র ছিলেন রায়বাহাদুর যতীন সিংহ। তিনি বোধ হয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন এবং বঙ্কিমের পর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এই পদের জন্য সাহিত্য চর্চ্চার অধিকার পেয়েছিলেন। এঁরা নিশ্চয়ই সুসাহিত্যিক, পদস্থ, সম্ভ্রান্ত, অর্থশালী পরগাছার দল....যাঁদের কাছে সাহিত্য মনের বিলাস—বাস্তব জীবনের কাছ দিয়েও এঁদের লেখা ঘেঁষতে পারে না...যেহেতু বাস্তব জীবনের যেটুকু অভিজ্ঞতা আছে, সেটায় আর যাই থাক, প্রাণের পরশ নেই।

এহেন হোমরা-চোমরা রায়বাহাদুর দাদার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আমি সেদিন বাজে শিবপুরে। সময়টা সকালের দিক। রায়বাহাদুর আসবার পর কুশল প্রশ্ন-বিনিময়, সদালাপ, মিষ্টভাষণ, চা-পান, ধূমপান প্রভৃতি নিতান্ত বাইরের শিষ্টাচার শেষ হলো। রায়বাহাদুর দাদাকে প্রশ্ন করলেন—চাটুজ্জে মশাই, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবার আছে—করতে পারি কি? দাদাকে শিষ্টাচারে কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারতো না। দাদা বিনীত ভাবে বললেন—নিশ্চয়ই পারেন, খুব পারেন।

—আচ্ছা, আপনি বেশ্যাদের নিয়ে সাহিত্যে স্থান দিলেন কেন?

—আপনি কি বেশ্যাদের কোনদিন দেখেছেন? একেবারে সোজা প্রশ্ন—দাদা শক্তিশেল ছাড়লেন। আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম—অবিশ্যি মনে মনে খুব খুশী। রায়বাহাদুরের মুখ চূর্ণ হয়ে গেল। তিনি কোন জবাব দিলেন না। দাদা হাত জোড় করে তাঁকে বললেন—আমার অপরাধ নেবেন না। আমার বলবার উদ্দেশ্য এই—যে-জিনিষ জানেন না, সেটা নিয়ে আলোচনা চলে না। আমি কেন ওদের সাহিত্যে স্থান দিয়েছি? যেহেতু ওদের মধ্যেও আমি সাহিত্যের রসের সন্ধান পেয়েছি।

রায়বাহাদুর আর কোন কথা বললেন না। মামুলী কথা-বার্তার পর তিনি বিদায় নিলেন। কিন্তু রায়বাহাদুরের দল সাহিত্যে সুরুচী-পন্থীর দল—তাঁরা এখানেই থামলেন না। তাঁরা গিয়ে কবিকে (রবীন্দ্রনাথকে) ধরলেন।

এই সময় সাহিত্য-বাজারে জোর গুজব বের হলো, কবির সাথে দাদার মন কষাকষি চলছে। এটাও রটলো—রবিবারে দাদার বাড়িতে নাকি এঁড়ে বাছুর হয় (দাদার গরু ছিল আমি দেখিনি—হয়তো পরে হয়েছিল)। তার নাম তিনি রবি রেখেছেন এবং সেটাকে 'রবি' 'রবি' বলেই ডাকেন। এ-কথা কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ দৈনিকে পর্য্যন্ত ছাপা হয়ে গেল। দাদার কাছে কবির চিঠি দেখেছি—কী আন্তরিকতায় ভরা! দাদা সব সময়েই কবির নাম শ্রদ্ধার সাথে বলতেন। কবির জয়ন্তীতে তিনি বড় অংশ নিয়েছিলেন।

গুজব বাড়তেই লাগলো। বিষয়টা আমাদের চোখে ও মনে

বিশ্রী দেখাতে লাগলো। আমি দাদাকে গিয়ে বললাম—সাহিত্যে সুরুচি আর কুরুচির দ্বন্দ্ব…এ-বিষয়ে আমি একবার কবির মুখ থেকে শুনে আসতে চাই।

দাদা আগ্রহের সাথে বললেন—তুমি যাবে?

—আমি যাবো। এইখানে বলা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না, কবি ছেলেবেলা থেকে আমাকে স্নেহ করতেন। শেষে আমাদের পরিবারের এক শাখা শান্তি নিকেতনে চার-পাঁচ বছর স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তার ফল হয়েছে—আমার তৃতীয় ভাই স্নেহাস্পদ সত্যেন * কলাভবন থেকে শিল্পীগুরু নন্দলালের কাছে থেকে আঁকতে শিখে, সে আজ সুদূর কাথিয়াড় রাজ্যের আর্ট-কলেজে শিল্প-কলার অধ্যক্ষ। শান্তি নিকেতনের সাথে আমাদের এই সম্বন্ধ।

আমি শান্তি নিকেতনে গেলাম। সময়টা ইংরেজী ৩৬।৩৭ সাল হবে।

কবির সাথে দেখা হলো—পাদবন্দনা, কুশল-প্রশ্ন শেষ হবার পর কবি হেসে বললেন—তোমাদের কী খবর?

—যদি অনুমতি দেন তবে বলি।

তিনি বলতে অনুমতি দিলেন। আমি আগেই জেনেছিলাম, চয়নিকা নতুন নামে বেরুচ্ছে—'সঞ্চয়িতা' নাম ঠিক হয়েছে। কবি নিজে তাঁর কবিতার সঙ্কলন করছেন। সাহিত্যে সুরুচি কুরুচির প্রশ্ন আমার আগে থেকেই ঠিক ছিল। আমি কবিকে জিজ্ঞাসা করলুম—আপনি নাকি 'সঞ্চয়িতা'র নতুন সঙ্কলন থেকে

---

* সত্যেন বিশী।

'চিত্রাঙ্গদা' বাদ দিচ্ছেন ? কথাটা আমরা ভাসা-ভাসা শুনেছিলাম। কবি বললেন—হাঁ দিচ্ছি। আমি তবুও সাহস সঞ্চয় করে জিজ্ঞাসা করলুম—ওরকম ভাল কবিতা বাদ যাবে ? ওটা কী অপরাধ করলো ?

কবি বললেন—অপরাধ ও কিছু করেনি। আমার আগের দিনে লেখা যে সব কবিতা এখন ভাল লাগে না, বাদ দিচ্ছি। এবার অন্যকে প্রশ্ন করা যায়, কবিকে করা যায় না। শেষ সাহস সঞ্চয় করে বললুম—কবিতার বিচার তো চিরদিন হৃদয় দিয়েই হয়ে আসছে। আপনার আগের লেখা কবিতা তাহলে এখন বাতিল হবে কেন ? কবি এবার দৃঢ়তার সাথে বললেন—আমার ভাল লাগে না। আমার যে লেখা ভাল লাগে না, সেটা বাতিল করার অধিকার আমার আছে। ও নিয়ে তোমরা আর প্রশ্ন করো না। যাদের পড়বার ইচ্ছা হবে, তারা আমার আগের সংস্করণের বই থেকে পড়বে।

আমি বললুম—এখন অবিশ্যি কিছুদিন পড়বে, শেষে এমন সব ভাল ভাল কবিতা আর খুঁজেই পাওয়া যাবে না।

কবি বললেন—যেটা যাবার সেটা অমনি যাবে। এরপর অন্য কথা হলো। আমার মন খুব দমে গেল। তখন মনে হলো, এই কি দরদী বাউল···মরমী সাহাজিয়া—যিনি আজ যৌবনের অনুভূতি দেখে ভয় পাচ্ছেন ? না, এঁর উপর অন্য-কোন সম্প্রদায়-বিশেষের যে প্রাধান্য-প্রতিপত্তির কথা শুনেছিলাম, সেই কথাই সত্য ? সেই বা কি করে সম্ভব ?

সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচির জবাব পাওয়া গেল। একদিন শান্তি নিকেতনে থেকে কলকাতা ফিরলাম। পরদিন দাদার ওখানে।

দাদার ওখানে গেলে আমাকে নীচে বসতে হলো—যা কোনদিন হয় নি, তিনি ওপরে। ভোলা (চাকর) বলে গেল—আপনি বসুন, তিনি আসছেন। একটু পরে দেখি ; ভোলা এক রেকাবে...রেকাবখানি শ্বেত পাথরের ..ছানা, মাখন, মিশ্রি, ক্ষীর, সর, আর নানারকম ফলের টুকরা এনে হাজির।

আমি বললাম—এসব কী রে ?

—প্রসাদ ! আপনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। আমি বললাম—প্রসাদ কিসের ? ভোলা সংক্ষেপে বললো—পূজার। ভোলার সাথে আর কথা কাটাকাটি না করে ওগুলোর সৎকারে মন দেওয়া গেল। খাওয়া শেষ হয়েছে, এমন সময় দেখি, চা'ও এলো। ভোলা বললে—চা খেয়ে ওপরে যাবেন। বাবু সেখানে যেতে বলেছেন।

ওপরে গিয়ে দেখি, একখানি ঘর ঠাকুর-ঘর হয়েছে—চারদিকে ফুলের ছড়াছড়ি...আর কী তাদের মিষ্টি গন্ধ, ধুপধুনোর গন্ধে মশগুল—সামনে রাখাল বেশে কৃষ্ণমূর্ত্তি। জয়পুরী সাচ্চা জরীর বুটিদার কল্কা দিয়ে তার চুড়ো...তাতে ময়ূরের পুচ্ছ—অনুরূপ হলদে রংয়ের সাটিনে তৈরী তার পরবার কাপড়, তাতে জরির পীতধড়া...যাকে আমরা বলি কোঁচা। হাতে রূপার মোহন বাঁশী ! আমি তো অবাক্ ! আমি বললাম—এ সব কী দাদা !

—দেখতেই ত পাচ্ছ, পূজো।

—তা দেখতে পাচ্ছি। এ সেই মূর্ত্তি না, যাকে আমি বয়ে নিয়ে এসেছিলাম ?

দাদা হেসে বললেন—সেই শ্রীমূর্ত্তি! সর্ব্বনাশ! মূর্ত্তি এবার শ্রীমূর্ত্তি হয়ে গিয়েছে। চেয়ে দেখি, দাদার পরনে গরদের ধুতি··· কপালে চন্দনের ফোঁটা।

একদিন আমি ও দাদা দেশবন্ধুর ওখানে এক সন্ধ্যায় যাই। হঠাৎ খবর এলো ফোনে—তারকেশ্বরে গুলি চলছে···তখন তারকেশ্বরে সত্যাগ্রহ চলছিল। এই সব সেরে ফিরতে রাত হলো। ফেরবার মুখে সিঁড়িতে শ্বেত পাথরের এক কৃষ্ণমূর্ত্তি দেখে দাদা তার খুব তারিফ করলেন। দেশবন্ধু তখনি সেটা তাঁকে দিয়ে দিলেন। মূর্ত্তির রাধা কোথায় ? জিজ্ঞাসা করায় দেশবন্ধু বললেন, সেটা চুরি গেছে। খুব হাসাহাসি হলো, এই বউ চুরি ব্যাপার নিয়ে। সেই মূর্ত্তি বয়ে নিয়ে আমি ট্যাকসিতে কেবল তুলেই দিই নি · দাদার সাথে বাজে শিবপুর পর্য্যন্ত রাত-দুপুরে তাকে বয়ে নিয়ে আসতে হয়েছিল—অবিশ্যি ট্যাকসিতে। সেদিন ছিল আবার জন্মাষ্টমী !

এই সে মূর্ত্তি, যার রূপান্তর হয়েছে আজ দেবত্বে।

আমি বললাম,—দাদা, সাহিত্যে সুরুচি-কুরুচির মীমাংসা হয়েছে। দাদা জানতে চাইলেন, কবি কি বললেন ? আমি এক কথায় সেরেছি—তিনি তাঁর নতুন সঙ্কলন কবিতার বইয়ে চিত্রাঙ্গদা বাদ দিচ্ছেন।

দাদা হেসে বললেন—তাই নাকি ?

আমি বললুম, কবির এক কথায় সুরুচি-কুরুচির মীমাংসা হয়ে গেল—কবির কাছে চিত্রাঙ্গদা এখন রুচি-মাফিক নয়।

দাদা বললেন—তাতো দেখতেই পাচ্ছি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—

আপনিও কি অচলা, অভয়া, কমল, কিরণময়ী এদের বাদ দেবেন ?

দাদা বললেন—কখনও না। আমি বাস্তব জীবনে যা দেখেছি, তাই লিখেছি—এরা জীবন্ত সত্য।

আমি বললাম—ভাল কথা। তবে আপনি যে ভাবে সুরুচির পেছনে ছুটছেন দেখছি, তাতে ওগুলো আজ না হয় কাল আপনার কাছে কুরুচি হয়ে যাবে।

দাদা হেসে বললেন—তোমরা দেখো কখনও তা হবে না।

আমি সহজ ভাবেই বললাম—কিন্তু পূজো-আহ্নিক নিয়ে যদি মেতে থাকেন, তাহলে চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে···মন দিয়েও আর সব জিনিষ ধরতে পারবেন না।

কেন পারবো না ? বামুনের ছেলে, বয়েস হয়েছে—পরকালের কথা এখন ভাবা দরকার।

এই কথায় দাদার মনের ভাব বোঝা গেল। বুঝলাম, তখন কবিও আর সেই দরদী-মরমী নন···ইনিও আর চরিত্রহীনের সতীশ বা শ্রীকান্তের দুর্দ্দান্ত ইন্দ্রনাথ নন। তাঁরা

এঁদের মন থেকে মরে গেছে। এঁরা এখন নতুন মানুষ। কবির কথা ছেড়েই দিলাম—দাদা এখন কি চান ?

পরকালের চিন্তা ? যিনি এত বড় বিপ্লবী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সমাজের সব বিচার করেছেন, তিনি কি আজ ছুটছেন এক অবাস্তবের পেছনে ? না, এটা এঁর অনিশ্চিত, অজানার উদ্দেশ্যে অভিসার ?

এঁর জীবনের এটা কোন্ প্রশ্ন ?

এ-প্রশ্নের তো আজ পর্য্যন্ত কেউ সমাধান করতে পারেনি। উপনিষদের ঋষি থেকে এ পর্য্যন্ত যাঁরা এই অনিশ্চিত, অলীক, আলেয়া পরলোকের পেছনে ছুটেছেন, সঠিক সমাধান কেউ কিছু বলতে পারেন নি। এ নিয়ে কাব্য বা গল্প লেখা চলে, কিন্তু কিছু ধরা-ছোঁয়া যায় না।

আমাকে ভাবতে দেখে দাদা বললেন, তুমি ভাবছো কী ?

—আমি ভাবছি, আপনার মধ্যে ইন্দ্রনাথ মরে গেছে।

দাদা বললেন—মরে নি, দেখে নিও।

বললুম—বেশ তাই হবে।

ফেরবার মুখে দাদা বললেন—সামতাবেড়ে আমার বাড়ি হয়ে গেছে—আমরা শীগ্‌গিরই যাবো। তুমি অবশ্য আসবে।

'আসবো' বলাতে, দাদা পথের নির্দ্দেশ দিলেন, আর বললেন—মাঝে মাঝে এলে প্রসাদ পাবে। এখন রাখাল-বেশ দেখছো, দুপুরে রাজ-বেশ, রাতে শৃঙ্গার-বেশ—এই সব হয়। প্রসাদও সেই রকম বদলায়।

আমি বললুম—ওতো দেখছি, এই রকম খেয়ে খেয়ে মুটিয়ে যাচ্ছে। এখন ওর রাধিকা না হলে ও ঘর ছেড়ে পালাবে। শেষে আপনি এই বয়সে নতুন হাঙ্গামায় পড়বেন।

দাদা বললেন—সেটা শীগ্‌গিরই হচ্ছে। জয়পুরে আমি রাধিকার জন্যে চেষ্টা করছি।

আমি বললাম—আভিজাত্যের কোন ত্রুটী নেই দেখছি। উনি নিজে মথুরার লোক—বউ আনতে হবে জয়পুর থেকে। কেন, বাংলায় কি মেয়ে পাওয়া যায় না ?

দাদা বললেন—বাংলার ভাস্কররা ভাল মূর্ত্তি গড়তে পারে না।

সামতাবেড়

রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড় গ্রামে দাদার বাড়িতে পৌঁছানো গেল সকাল দশটায়। ষ্টেশনে দাদা পালকি পাঠিয়েছিলেন বেয়ারাদের হাতে আমার নাম লেখা একখানা চিঠি দিয়ে। ছেলেবেলায় পালকি করে ইস্কুলে যেতাম—তারপর আর পালকি বা মানুষের ঘাড়ে চাপি না ··রিকসাতেও না। পালকির সাথে সাথে হাঁটা-পথে চললাম। যখন দাদার বাড়ি এসে পেঁছিলাম, কী সুন্দর দৃশ্য! অশান্ত রূপনারায়ণ বয়ে চলেছে—তখন সে গতি মন্থর নয়—ভীষণ আবর্ত্তে উল্কাবেগে। সময়টা ছিল ভাদ্রমাস। তার উপর সকালের সোনালী রোদ পড়ে, আলো-ছায়ার কী বিচিত্র খেলা জলে ভেসে যাচ্ছে—নদীর বুকে

পাল তুলে নৌকা সার বেঁধে চলেছে! সত্যিকার বাংলা চোখের সামনে এসে গেল—বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে গেলো। দাদা বাইরেই পায়চারি করছিলেন। একেবারে গ্রামের পরিবেশে খাপ খাইয়েছেন—খড়ম পায়ে, খালি গা, হাতে থেলো হুঁকো। আমাকে দেখে বললেন—তুমি হেঁটে এসেছো! পালকি কি হলো? দেখিয়ে দিলাম পালকি পেছনে। কী সুন্দর ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছে—ক্লান্তি এক নিমেষে চলে গেল।

দাদা আমাকে নিয়ে বসালেন বটতলায়…ঠিক তাঁর বাড়ির সামনে—সেটা স্বামী বেদানন্দের সমাধি। বেদানন্দ তাঁর ভাই ছিলেন—পরে রামকৃষ্ণ মঠে সন্ন্যাসী হয়ে যান। সেখানে বসে জিরিয়ে বাড়িতে প্রবেশ করা গেল। বড় কম্পাউণ্ডের মধ্যে কুড়ি ইঞ্চি পাকা দেয়ালের উপর…বোধ হয় ওপরে রাণীগঞ্জ টালির… দোতালা বাড়ি। আমি বললাম—এতো পুরু দেয়াল দিলেন কেন? এ যে দুর্গ বিশেষ।

দাদা হেসে বললেন—অনেক দিন যাবে।

কানে খট্ করে কথাটা বাজলো—এ তো শিল্পীর কথা নয়! গৃহ-বাটি সব চিরস্থায়ী নয়; নিজের ছেলে-পুলে, নাতি-নাতনিরা সব ভোগ করবে—এ তো সেই সনাতন মনোবৃত্তি! তবে এর ভেতর শিল্পী কি মরে গেছে? এর কৃষ্ণ-পূজা দেখবার পর থেকে, পরকালের চিন্তায় নিজেকে সপে দেওয়া দেখে আমার সংশয় বেড়েই চলছিল, শিল্পী শরৎ বুঝি আর নেই! আজ কুড়ি ইঞ্চি দেয়াল দেখে সে-ধারণা আরো কায়েম হলো। মুখে

আমি কিছু বললাম না। দাদা নিজে ঘুরে ঘুরে সব দেখালেন—বাড়ি, পুকুর, বাগান, চাঁপা, শিউলী ফুলের গাছ, রজনী গন্ধার ঝাড়! আমি ভারী খুশী হয়েছি দেখে দাদা বললেন—এ সব যে আমার হবে, তা আমি কোনদিন ভাবতেও পারিনি। তিনি বললেন—কাশীতে ভৃগু (ভৃগু সংহিতার গণনা) আমি দেখাই। তখন তারা বলেছিল, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি নি।

আমি বললাম—দাদা, এখন সব ভোগ করুন।

দাদা বললেন—আমার নিজের জন্য নয়। তাঁর ভাইয়ের ছেলেদের দেখিয়ে বললেন—এদের জন্যে।

যাক্, একটা গুরুভার বুক হতে নেমে গেল। এ নিজের জন্য কিছু চায় না। শিল্পী তাহলে তো মরে নি! তবুও সংশয় গেল না। তারপর বাড়িতে বসে গল্প-গুজব, খাওয়া-দাওয়া। দেখলাম, গ্রামের লোক দাদাঠাকুর বলে ওঁকে খুব মানে। তাদের যুক্তি-বুদ্ধি, সলা-পরামর্শ—সব তাঁরা দাদার কাছ থেকে নেয়। দেখলাম, গণমনের চেতনার সাথে আজও যোগ আছে। এদের দুঃখ-দরদ ইনি বোঝেন।

শিল্পী তাহলে সত্যই মরে নি?

১৯৩৯ সাল

সামতাবেড়ে আমি আরো দু'বার যাই দাদাকে দেখতে। একদিন ফেরবার মুখে দাদা ছাড়লেন না, বললেন—খানিকটা পথ তোমাকে এগিয়ে দিই। আমার নিষেধ শুনলেন না। প্রায়

মাঝ-পথ পর্য্যন্ত হেঁটে আমার সাথে এলেন। দেখি, দাদা হাঁপাচ্ছেন। তখনি মনে হলো, দাদা বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবেন না। আমার ভেতরের সনাতন ভবঘুরে আমাকে আবার কিছু দিনের জন্য বাংলা দেশের বাইরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে শুনলাম, দাদার বাড়ি হয়েছে কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে। চললুম দেখতে। আমি তখন ঐ পাড়াতেই থাকি। দাদা আমাকে দেখে খুব খুশী! নিজে বাড়ি দেখালেন—কত খরচ পড়েছে বললেন। শেষে বাড়ির পেছনে নিয়ে দেখালেন যে, কর্পোরেশনের নিয়ম-কানুন মাফিক দশ ফুট খোলা জায়গা রাখতে হয়। দাদা বললেন—দেখ, আমি তা মানি নি। আমি দশফুটের মধ্যেই ঘর করেছি। বলে দুই বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে বললেন—কেমন জব্দ করেছি! বলে খুব হাসলেন।

আমি তাঁর আগের দিনের শিশুর মত সরল হাসি—বিশেষ করে এই কর্পোরেশনের আইন-অমান্য উপলক্ষ্য করে—দেখে অবাক হয়ে গেলাম। ভাবলাম, কী ভুলই না আমি করেছিলাম! শিল্পী শরৎ মরে নি। তাঁর হাসি দেখে মনে হলো, এ নিজের জীবনে কোন কাজের জন্য কাউকে কৈফিয়ত দেয় না—পরের কাছেও না, নিজের কাছেও না। আমি তাঁকে পূজো-অর্চ্চনা করতে দেখে ভুল বিচার করেছিলাম ভেবে আমার অন্তর গ্লানিতে ভরে গেল।

তারপর তাঁর বসবার ঘরে এসে চা-পান। চা খেতে খেতে বললেন—তুমি ছিলে না; কোলসন সাহেব—কলিকাতার

পুলিশ-কমিশনার—আমার সাথে দেখা করেন। তাঁর বাড়িতে চায়েরও নিমন্ত্রণ করেন—তাঁর স্ত্রী নিজ হাতে চা' করে দিয়েছেন। সাহেবের অনুরোধ—আমি একখানা চার অধ্যায়ের মত বই লিখি। আমি বললাম—আপনি চার অধ্যায়ের মত বই লিখবেন, তাহলে পথের দাবী পুড়িয়ে ফেলুন। দাদা বললেন—তোমরা দেখে নিও। এই সময়েই বোধহয় দাদা বিপ্রদাস লিখলেন, কিন্তু চার অধ্যায় আর করতে পারলেন না : শেষকালে জমিদার খাড়া করে এক খিচুড়ি পরিবেশন করলেন।

আমি দাদার ওখানে অশ্বিনী দত্ত রোডে প্রায়ই যেতুম। একদিন দাদা বললেন—ছাখো, কোলসন সাহেব তোমার কথায় বলে যে, সে সব জানে—তুমি কি খাও, আর রাত্রে কোথায় ঘুমোও।

আমি বললাম—দাদা, সাহেবকে বলবেন, সে সব পুরোনো কাসুন্দী এখন চট্‌কে লাভ নেই। খাই আমি বাড়িতেই, আর কোথায় শুই, সাহেব তো জানেনই…সেটা তাঁকেই জিজ্ঞাসা করবেন।

একদিন দাদা বললেন, ওহে, সুভাষ তোমাকে ডেকেছে। তুমি যত শীগ্‌গির পারো, তাঁর সাথে দেখা করো।

আমি রাজনীতির সংস্রব ছেড়ে দেবার পর কলকাতায় থাকলে এক সুভাষবাবুর সাথেই মাঝে মাঝে দেখা করতাম। তাঁর অনুরোধ ছিল—আপনি আমার কাছে আসবেন।

আমি জিজ্ঞাসু হয়ে দাদার মুখের দিকে চাইলাম। দাদা

বললেন—হালে তিনি সুভাষবাবুর সাথে কোন এক কনফারেন্সে নোয়াখালী না কুমিল্লা কোথায় গিয়েছিলেন। কোন এক কংগ্রেস কর্ম্মী সম্বন্ধে কথা তাঁর আমার মুখে শোনা বিশেষ প্রয়োজন—দাদা সেই কথা বললেন। তাঁর নাম দাদা করলেন, তাঁকে আমরা মাতা-হরি বলে নিজেদের মধ্যে হাসি-ঠাট্টা করে ছদ্মনামে ডাকতাম।

আমি বললাম—আপনি মাতা-হরির কথা তাঁকে বলেন নি? দাদা বললেন—বলেছি। জানই তো সুভাষের অভ্যাস, নিজে যা বুঝবে, সেটা কেউ বদলাতে পারবে না।

আমি বললাম—আপনি যা পারেন নি, আমি সেটা কী করে পারবো? দাদা বললেন—তুমি পারবে…তোমার first hand information.

মনে মনে ভাবলাম, এ এক ফ্যাসাদে পড়া গেল। সুভাষ-বাবুর সাথে দেখা হওয়া আনন্দের ও ভাগ্যের কথা, কিন্তু রাজ-নীতি ও পরচর্চ্চা করা অপ্রিয় ও ফ্যাসাদের।

কী আর করা যায়? আমি সকালে স্নান সেরে, বেরিয়ে পড়লাম এলগিন রোডের উদ্দেশ্যে। সে ছিল বৎসরের প্রথম দিন—১লা বৈশাখ। তাইতো! খালি হাতে সুভাষবাবুর সাথে আজকের দিনে কী করে দেখা করা যায়? পথে বেরিয়ে দেখি—দুধারে বকুল গাছ হতে পথে ফুল ছড়িয়ে পড়েছে। এক পকেট বকুল ফুল কুড়িয়ে নিলাম। লেক মার্কেটের সামনে এসে ভাবলাম, দেখি, পদ্ম পাওয়া যায় কি না? ভাগ্য ভাল,

শ্বেতপদ্ম জুটে গেল। শ্বেত পদ্ম ও বকুল ফুল নিয়ে সুভাষবাবু দর্শনে চললাম। তিনি বলে দিয়েছিলেন—তাঁর সাথে নিরিবিলি কথা বলতে হলে সকাল আটটার মধ্যে যেতে। তারপর থেকেই লোকের ভীড় চলে সমানে দিন রাত। যখন এলগিন রোডে পৌঁছলাম, দেখি, আটটা বেজে গেছে এবং নীচে দর্শন-প্রার্থীর ভিড় জমতে শুরু হয়েছে। দ্বার-দেবতা চেনা লোক। তাঁকে বললাম—আমি এখুনি দেখা করতে চাই। দ্বার দেবতা বল্লেন—হবে না। তিনি হিন্দী শিখছেন—এক ঘণ্টা দেরী হবে।

আমি বললাম—দেখা করা না-করার মালিক তিনি? আপনি আমার নামের শ্লিপটা পাঠিয়ে দিন—পরে তিনি যা' বলেন সেই মত ব্যবস্থা হবে। তিনি নেহাৎ পীড়াপীড়িতে ও অনিচ্ছায় আমার শ্লিপটা উপরে পাঠালেন। সঙ্গে সঙ্গে চাপরাসি এসে বললে—যাইয়ে, বোলাতে হৈঁ। যাক, বাঁচা গেল। দ্বার-দেবতা বিমুখ হয়ে মুখ ফেরালেন। ওপরে উঠে নমস্কার-সম্ভাষণ জানিয়ে নববর্ষের শুভ-কামনা ক'রে, তাঁর হাতে ফুল দিলাম। তিনি খুব খুশী হলেন…বকুল ফুলের ঘ্রাণ নিলেন….পদ্ম পাশে রেখে দিলেন। সেদিন দেখি, রূপ যেন তাঁর ফেটে পড়ছে। তিনি সদ্য স্নান করেছেন—ধোপ-করা খদ্দরের পাঞ্জাবী ও খদ্দরের কোঁচান ধুতি পরেছেন এবং বিদ্যাসাগরী চটিতে বাঁ পা রেখে ডান পা'খানি ইজি-চেয়ারে তুলে বসেছেন। সাদা পাঞ্জাবীর ভেতর থেকে যেন চাঁপা ফুলের রং ফেটে পড়ছে!

তিনি হিন্দী শিখছিলেন। এর আগে তিনি স্নান করে

পূজা-আহ্নিক সেরেছেন। ইদানীং তিনি পূজো-আহ্নিক করতেন ও কালী-ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন—সামনে কালীর পট, তার চারিদিকে ফুল দিয়ে সাজান। আমি বললাম—হিন্দী রাষ্ট্রভাষা চালাচ্ছেন কেন? আপনি যা' চালাবেন—তাই হবে। রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা! তিনি বললেন—পরে হবে ..এখন নয়। আগে আমাদের ওদের মন জয় করতে হবে। হিন্দী না হলে হিন্দুস্থানের গণমনের সাড়া পাওয়া যাবে না.. তাদের মনের গোড়ায় পৌঁছান যাবে না।

তারপর দাদা যে জন্য পাঠিয়েছেন বললাম।

তিনি বললেন—আপনি থাকেন কোথায় জানি না, আমি আপনার খোঁজও করেছিলাম। এখন আপনার first hand information বলুন।

আমি যা জানি বল্‌লাম। তিনি কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকলেন। পরে বললেন—কী করে জানবো? কর্ম্মীদের টাকা না দিলে হয় না। তার মধ্যে যে এত ফ্যাসাদ কে জানে?

আমি বল্‌লাম অন্ততঃ আপনার তো জানা উচিত।

এরপর উঠতে হয়—তাঁর সময়ের দাম আছে। আমি উঠি উঠি করেও উঠতে পারছি না, আমার হাত-পা কে যেন পেরেক দিয়ে চেয়ারে এঁটে দিয়েছে।

তিনি আমার মুখের দিকে চেয়ে বললেন— কী দেখছেন?

—আপনাকে।

—আমাকে এতো কী দেখছেন?

আমি বল্‌লাম—যদি অনুমতি দেন তো বলি। তিনি বলবার

অনুমতি দিলেন। সেদিন আমার কী হয়েছিল জানি না, বোধহয় আমার মধ্যে সুপ্ত নারী-প্রকৃতি জেগে উঠেছিল! আমি অভিভূতের মত বললাম—আপনাকে দেখে বলতে ইচ্ছা করছে, 'তোমার এত রূপ, ভূজ-বাঁধনে বাঁধি দেহ দণ্ড।'

মুহূর্ত্ত মাত্র—তারপর কী হলো জানি না। আমার সম্বিত ফিরলে দেখি, তিনি ইজিচেয়ার থেকে উঠে এসে আমাকে আলিঙ্গন করে হেসে বলছেন—কেমন হলোতো ?

সেদিন তাঁর মুখে যে-হাসি দেখেছি, আমি তা কখনও ভুলবো না। শুনেছি, এই হাসি দিলীপ দেখেছেন, আর একজন বলেন, তিনিও দেখেছেন—কল্যাণীয় শ্রীমান সুরেশ*—কাশীর উত্তরার সম্পাদক। আর সে-হাসি দেখবার ভাগ্য সেদিন আমার হয়েছিল।

আমার সেদিন নবজন্ম লাভ হলো। রোমা রেঁালার ভাষায় বলতে গেলে, শিল্পীর নবজন্ম। পরে তিনি হেসে বললেন—কেমন, আজ মৃত্যুদণ্ড আপনার হলো তো ?

আমি বললাম—হলো।

এর মধ্যে একটু ইতিহাস আছে। দাদাও তাঁর সাথে জড়িত। ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেসের পর যতীনের† (বিপ্লবী মেজর যতীন দাশ) প্ররোচনায় আমাকে দক্ষিণ কলিকাতা ব্যাটেলিয়নের দ্বিতীয় মেজর হতে হয়। ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক

* সুরেশ চক্রবর্ত্তী।

† ষাট দিন প্রায়োপবেশন করে তিনি লাহোর জেলে মারা যান।

বন্ধুবর মেজর সত্য গুপ্ত। তাঁরা সব জাত-বিপ্লবী—আজন্ম তাঁরা দুঃখ বরণ করেছেন দেশের সেবার জন্য। আমি যতীনকে বললাম—আমি পারবো না। যতীন তা শুনলো না।

শেষ পর্য্যন্ত আমি পারিও নি। যতীন আমাকে ক্রশ-বেল্ট, জঙ্গি টুপি, বুট ও ইউনিফর্ম্ম দিয়ে সাজিয়ে গলায় তিনটি তারা লাগিয়ে, রুট মার্চ্চ, পতাকা অভিবাদন সমানে চালালো, আমাকে দিয়ে। স্যালুট নিতেন—G. O. C. (সুভাষবাবু) ও দাদা একবার হাজরা পার্কে নিয়েছিলেন।

তারপর যে যা পারবে না, সে-কাজে গেলে ফল যা হয়। আমি পড়লাম ধরা—জেলের দোর থেকে বেরিয়ে আসতে হলো। সেই দিন রাতে দাদা ও সুভাষবাবু আমার ওখানে এলেন। আমি অফিসারের ইউনিফর্ম্ম পোশাক, পিস্তল রাখবার খাপ সব ফেরত দিলাম সুভাষবাবুকে (জি-ও-সি)। গ্লানিতে আমার মন ভরে গেল। আমি সুভাষবাবুকে বললাম—আপনি কোর্ট মার্শাল করে আমাকে নিজ হাতে গুলি করে মেরে ফেলুন। এ-গ্লানি আমি সইতে পারছি না। অবিশ্যি কোর্ট মার্শাল হলো—আমার অপরাধ সাব্যস্ত হলো civil nature দেওয়ানী। মিলিটারী কোঠায় হলো না। আজ তাই নিজ হাতে আমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে সুভাষবাবু বললেন—কেমন হলো তো? আর আমাকে পায় কে? ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি, আধ ঘণ্টা হয়ে গেছে। কী সর্ব্বনাশ! আধ ঘণ্টা সময় আমি এঁর নষ্ট করেছি! আর না···উঠে পড়লাম! তিনি বারে বারে বললেন—সময়

পেলেই আসবেন। তাঁকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এলাম, কিন্তু আর তাঁর সাথে আমার দেখা হয় নি। একবার তাঁর চিঠি পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল।

দাদাকে সব বললাম। দাদা আমার পিঠ চাপড়ে বললেন—এই জন্যেই তো পাঠিয়েছিলাম। আজ মন ভাল হলো তো।

আমি সেদিনকার মত দাদার কাছ থেকে বিদায় নিলাম।

আমার ভবঘুরে স্বভাব আবার আমাকে কলকাতার বাইরে নিয়ে যায়—বছর-দুই আসিনি।

এসে শুনলাম, দাদা নেই। সেকি কথা! প্রথমে বিশ্বাস করতেই ইচ্ছা হলো না; পরে সব শুনে আর কী করা যায়! মনে হলো, একে একে নিভিছে দেউটি—বাংলার জ্যোতিষ্ক যাঁরা আকাশ উজ্জ্বল করে থাকতেন, তাঁরা সব চলে যাচ্ছেন—দেশবন্ধু, শরৎ, সুভাষ। যখন শুনলাম, দাদা থিয়েটার রোড, না পার্ক ষ্ট্রীটের এক নার্সিং-হোমে মারা গিয়েছেন, ওঃ! তখন আমার শোকের ভার কোথায় চলে গেল—বুক থেকে যেন আমার পাথর-চাপা নেমে গেল।

তাইতো! শেষ পর্য্যন্ত তিনি দেখিয়ে গেলেন, শরৎচন্দ্র বাড়িতে মরেন না…তিনি মরেন হাঁসপাতালে। এক নিমেষে মনে হলো, এই অসাধারণ বিপ্লবী এক লাথি মেরে তাঁর বাড়ি-ঘর সব ছুঁড়ে, বিভিন্ন পরিবেশ ও বিভিন্ন লোকের মধ্যে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ফেললেন। তাঁকে চারিদিক থেকে সকলে ঘিরে শোক করবে—

এটা তিনি দেখতে চাইলেন না। তাঁর জীবনের উল্কা-গতি উল্কার মতই আকাশে চলে গেল—যাত্রাপথে কাউকে বাধা দিতে দিলেন না। তখন মনে হলো, দাদার সেই 'দেখে নিও' কথাই ঠিক। দেখলাম—বিপ্লবী শরৎ, শিল্পী শরৎ শেষ পর্য্যন্তও মরে নি। লোকের কাছে জেনে, তাঁর চিতায় দুধ দিয়ে আমার শেষ শ্রদ্ধা জানালাম।

এতদিন পরে আজ এই স্মৃতি-কথা লিখতে গিয়ে মনে হচ্ছে, আমার এই অসংলগ্ন প্রলাপ, এই হবি দিয়ে কোন্ দেবতার পূজা করবো? তুমিই বল—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেমঃ?

আর আজকের এই স্মরণীয় দিনে * তোমার মুখের কথা দিয়েই তোমার স্মৃতি-পূজা শেষ করি ঃ—

"আজ যদি তাঁরা মনে করেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাঁদের পাওয়া হলো,—একদিন টের পাবেন এত বড় ভুল আর নেই।

আমি আমার মুসলমান ভাইদের বলছি, তোমরা সংস্কৃতির ওপর নজর রেখো, সাহিত্যের উপর নজর রেখো, আর ছোট-ছেলের মত ধারালো ছুরি হাতে পেয়েছ বলে সব কেটে ফেলো না।"

তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার।

*১৫ই আগষ্ট, ১৯৪৭।

সমাপ্ত